যাত্রাবদল

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পি·সি·সরকার এণ্ড কোং
২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশক—

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সরকার,

২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্,

(কলেজ স্কোয়ার নর্থ)

প্রথম সংস্করণ

কার্ত্তিক, ১৩৪১

দেড় টাকা



শ্রদ্ধাষ্পদ

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

করকমলেষু

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

যাত্রাবদল

ভণ্ডুলমামার বাড়ী

পাড়াগাঁয়ের মাইনার স্কুল। মাঝে মাঝে ভিজিট্ করতে আসি, আর কোথাও থাকবার যায়গা নেই, হেড্ মাষ্টার অবিনাশবাবুর ওখানেই উঠতে হয়। অবিনাশবাবুকে লাগেও ভাল, বছর বিয়াল্লিশ বয়েস, একহারা চেহারা, বেশ ভাবুক লোক। বেশী গোলমাল ঝঞ্ঝাট পছন্দ করেন না, কাজেই জীবনের পথে বাধা ঠেলে অগ্রসর না হ'তে পেরে দেবলহাটি মাইনার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে পনেরো বছর কাটিয়ে দিলেন এবং বাকী পনেরোটা বছর যে এখানেই কাটাবেন তার সম্ভাবনা ষোলআনার ওপর সতেরো আনা।

কার্ত্তিক মাসের শেষে হেমন্ত সন্ধ্যা। স্কুলের বারান্দাতে ক্লাস-রুমের দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে আমরা গল্প করছিলাম। সামনে একটা ছোট মাঠ, একপাশে একটা বড় তুঁত গাছ, একপাশে একটা মজা পুকুর। সামনের কাঁচা রাস্তাটা গ্রামের বাজারের দিকে গিয়েচে, স্থানটা নির্জ্জন।

চায়ের কোন ব্যবস্থা এখানে হওয়া সম্ভব নয়, তা জানি। একটি গরিব ছাত্র হেডমাষ্টারের বাসায় থেকে পড়ে আর তাঁর হাটবাজার করে। সে এসে দুটো রেকাবিতে ঘি-মাখানো রুটি, আলুচচ্চড়ি ও একটু গুড় রেখে গেল। আমি বল্‌লুম—অবিনাশবাবু, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে—বেশ গরম মুড়ি খাবার ইচ্ছে হচ্চে, কিন্তু···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—সার্টেন্‌লি—ওরে ও কানাই, শোন্, শোন্, যা দিকি একবার গঙ্গার বৌয়ের বাড়ি, আমার নাম ক'রে বলগে দুটি গরম মুড়ি ভেজে দ্যায়—এক্ষুণি ··

আমি বল্‌লুম অভাবে চাল ভাজা···

তারপর গল্পগুজবে আধঘণ্টা কেটে গেল। অবিনাশবাবু কথা বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্কভাবে মাঝে মাঝে বাঁ-ধারের মজা পুকুরটার দিকে চাইছিলেন। হঠাৎ বললেন—মুড়ি আসুক, একটা গল্প বলি ততক্ষণ। শুনুন, ইন্সেপেক্টারবাবু। এই রকম শীতের সন্ধ্যাতেই কথাটা মনে পড়ে। আপনাকে পেয়ে মনে এত আনন্দ হয়!···এখানকার লোকজন দেখচেন তো? সব দোকানদার, লেখাপড়ার কোন চর্চ্চা নেই, ছেলেপিলেকে লেখাপড়া শেখায় এইজন্যে যে কোনো রকমে ধারাপাত আর শুভঙ্করীটা শেষ করাতে পারলেই দাঁড়ি ধরাবে। কারুর সঙ্গে কথা ব'লে সুখ পাইনে, ঝালমসলার দরের কথা কাঁহাতক আলোচনা করি বলুন। ভদ্রঘরের ছেলে, নাহয় এসে পড়েচি পেটের দায়ে এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে, কিন্তু তা বলে মনটা তো—কলেজের দু চার ক্লাস চোখে দেখেছিলামও তো—পড়াশুনো না-হয় নাই করেচি···

দেখলাম অবিনাশবাবু কলেজের দিনগুলোর কথা এখনও ভুলতে পারেন নি। বেচারীর জীবনে জাঁক্‌জমক নেই, আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরাশা নেই, সে সাহসও বোধ করি নেই। তাঁর যা-কিছু অভিজ্ঞতা, যা-কিছু কর্ম্মনৈপুণ্য, সবই এই অনাড়ম্বর সরল জীবনধারাকে আশ্রয় ক'রে। কলেজের দিনগুলোতেই শহরের মুখ দেখেছিলেন. আড়ম্বর বা বিলাসিতা মনেরই বলুন বা দেহেরই বলুন—ঐ কলেজের ক'টা বছরেই তার

আরম্ভ ও শেষ। সে দিনগুলো যত দূরে গিয়ে পড়চে, রঙীন স্মৃতির প্রলেপ তাদের ওপর যে তত বিচিত্র ও মোহময় হয়ে পড়বে এটা খুব স্বাভাবিক বটে।

অবিনাশবাবু তামাক ধরিয়ে আমার হাতে দিয়ে আবার বল্‌তে সুরু করলেন।

—হুগলী জেলার কোনো এক গ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ছিল কেন? এখন নেই?

সে কথা পরে বল্‌চি। না, এখন নেই ধরে নিতে পারেন। কেন যে নেই, তার সঙ্গে এই গল্পের একটা সম্বন্ধ আছে গল্পটা শুনলেই বুঝবেন।

হুগলী জেলার কোনো এক গ্রামে আমার মামার বাড়ি ছিল। ছেলেবেলায় যখন সর্ব্বপ্রথম মায়ের সঙ্গে সেখানে যাই, তখন আমার বয়েস বছর পাঁচেক। আমাদের মামার বাড়ির পাড়ায় আট নয় ঘর ব্রাহ্মণের বাস, ঘেঁষাঘেঁষি বসতি, এক চালে আগুন লাগলে পাড়াসুদ্ধ পুড়ে যায়, এমন অবস্থা। কোঠাবাড়ি ছিল কেবল আমার মামাদের, আর সব খড়ের ছাউনি, ছোট-বড় আটচালা ঘর, এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া যাবার পথে একটা বড় আম কাঁটালের বাগান, বনজঙ্গল, সজনে গাছ ও দু-একটা ডোবা। বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকদূর গেলে তবে ও-পাড়ার প্রথম বাড়িটা। সেই বনজঙ্গলের মধ্যে কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা হচ্চে।

সে-বার কিছুদিন থেকে চলে আসবার পর আবার যখন মামার বাড়ি গেলুম, তখন আমার বয়স আট বছর। গ্রামটা অনেক দিন পরে দেখতে

বেরিয়ে চোখে পড়ল, এ-পাড়া ও ও-পাড়ার মধ্যে বাঁ-দিকে ডোবার ধারের একটা জায়গা। একটু অবাক হয়ে গেলাম। ডোবার পাড়ের জঙ্গল অনেকটা কাটানো, কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা অবস্থায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু মনে হল অনেক দিন গাঁথুনির কাজ বন্ধ আছে, যে-জন্যই হোক, কারণ, ভিতের গায়ে ও ঘরের মেজেতে ছোট-বড় ভঁটশেওড়ার গাছ গজিয়েচে, চুণ-সুরকী মাখার ছোট খানাতে পর্য্যন্ত বনমূলোর চারা। মনে পড়ল, সে-বার এসে বাড়িটা গাঁথা হচ্চে দেখেছিলুম। এখনও গাঁথা শেষ হয়নি তো? কারা বাড়ি তুলচে?

ছুটে গিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলুম।

···কারা ওখানে বাড়ি করচে দিদিমা, সে-বার এসে দেখে গিইচি, এখনও শেষ হয়নি?

···তোর এত কথাও মনে আছে।···ও তোর ভণ্ডুলমামা বাড়ি করচে এখানে তো থাকে না, তাই দেখাশোনার অভাবে গাঁথুনি এগুচ্চে না।

আমার ভারী কৌতুহল হ'ল, সাগ্রহে বললুম ভণ্ডুলমামা কোথায় থাকে দিদিমা? ভণ্ডুলমামা কে?···

—ভণ্ডুল রেলে চাকরি করে, লালমণিরহাটে না কোথায়। আমাদের গাঁয়েই ছেলেবেলায় থাকৃত, বাড়িঘর তো ছিল না। ও-পাড়ার মুখুয্যে-বাড়ির ভাগ্নে, এখন চাকরিবাকরি করচে, ছেলেপুলে হয়েচে, একটা আস্তানা তো চাই? তাই টাকা পাঠিয়ে ছায়, মুখুয্যেরা মিস্ত্রী লাগিয়ে ঘরদোর সুরু ক'রে দিয়েচে, নিজে ছুটিতে এসে মাঝে মাঝে দেখাশুনো করে···

আমি ছাড়বার পাত্র নই, বল্লুম—তবে বাড়ি গাঁথা হচ্চে না কেন? মুখুয্যেরা তো দেখলেই পারে?

তা নয়, সব সময় তো টাকা পাঠাতে পারে না? যখন পাঠায়, তখন মিস্ত্রী লাগানো হয়।

কি জানি কেন সেই থেকে এই ভণ্ডুলমামা ও তাঁর আধ-গাঁথা বাড়িটা আমার মনে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার ক'রে রইল। রূপকথার রাজপুত্রের মতই এই ভণ্ডুলমামা হয়ে রইলেন অবাস্তব, স্পর্শের অতীত, দর্শনের অতীত, এক মানস-রাজ্যের অধিবাসী, তাঁর চাকরীর স্থান লালমণির হাট, মায় তাঁর ছেলেমেয়েসুদ্ধ। তাঁর টাকা পাঠাবার ক্ষমতা বা অক্ষমতাও যেন কোথায় আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতির বিষয়ীভূত হয়ে দাঁড়াল, অথচ কেন এসব হ'ল তার কোন ন্যায়-সঙ্গত কারণ আজও মনের মধ্যে খুঁজে পাই না।

কতবার দিদিমাদের চিলেকোঠার ছাদে শুয়ে দিদিমার মুখে রূপকথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক মনে ভেবেচি—লালমণিরহাট থেকে ভণ্ডুলমামা আবার কবে টাকা পাঠাবে বাড়ি গাঁথার জন্যে?…না, এবার বোধ হয় নিজে আস্‌বে। মুখুয্যেরা বোধ হয় ভণ্ডুলমামার টাকা চুরি করে, তাই ওদের হাতে আর টাকা দেবে না। বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্পের ফাঁকে দিদিমাকে কখনো বা জিগ্যেস্ করি—লালমণিরহাট কোথায় দিদিমা? দিদিমা অবাক হয়ে বলেন—লালমণিরহাট! কেন, তাতে তোর হঠাৎ কি দরকার পড়ল?…তা, কি জানি বাপু কোথায় লালমণিরহাট? নে নে, ঘুমুস্ তো আমায় রেহাই দে,—রাত্তিরে এখন গিয়ে আমায় দুটো মোচা কুটে রাখতে হবে, ঠাকুরঘরের বাসন বের করতে হবে, ছিষ্টির

কাজ পড়ে রয়েচে—তোমায় নিয়ে সারা রাত গল্প করলে তো চলবে না আমার ?

আমি অপ্রতিভের স্বরে বলতুম—না দিদিমা, গল্প বল, যেও না, আচ্ছা মন দিয়ে শুনচি।

এর পরে আবার মামার বাড়ি গেলুম বছর দুই পরে। এই দু-বছরের মধ্যে আমি কিন্তু ভণ্ডুলমামার বাড়ির কথা ভুলে যাইনি। শীতের সন্ধ্যায় গোয়ালে সাঁজালের ধোঁয়ায় আমাদের পুকুর পাড়টা ভরে যেত, বনের গাছপালাগুলো যেন অস্পষ্ট, যেন মনে হ'ত সন্ধ্যায় কুয়াসা হয়েচে বুঝি আজ, সেই দিকে চাইলেই আমার অমনি মনে পড়তো ভণ্ডুলমামার সেই আধ-তৈরি কোঠাবাড়িটার কথা—এমনি শেওড়াবনে ঘেরা পুকুর পাড়ে—এতদিনে কতটা গাঁথা হ'ল কে জানে ? এতদিন নিশ্চয় ভণ্ডুলমামা মুখুয্যেবাড়ি বাড়ি টাকা পাঠিয়েচে !

মামার বাড়িতে রাতে এসে পৌঁছলাম। সকালে ঐ পথে বেড়াতে গিয়ে দেখি—ও মা, এ কি, ভণ্ডুলমামার বাড়িটা যেমন তেমনি পড়ে আছে ! চার-পাঁচ বছর আগে যতটা গাঁথা দেখে গিয়েছিলুম, গাঁথুনির কাজ তার বেশী আর একটুও এগোয়নি, বনে জঙ্গলে একেবারে ভর্ত্তি, ইটের গাঁথুনির ফাঁকে বট-অশথের বড় বড় চারা ! আহা, ভণ্ডুলমামা বোধ হয় টাকা পাঠাতে পারেনি আর !

ভণ্ডুলমামার সম্বন্ধে সে-বার অনেক কথা শুনলুম। ভণ্ডুলমামা লালমণিরহাটে নেই, সান্তাহারে বদলি হয়েচে। তার এখন দুই ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলেটি আমারই বয়সী, ভণ্ডুলমামার মা সম্প্রতি মারা

গিয়েচে। বড় ছেলেটির পৈতে হবে সামনের চৈত্র মাসে। সেই সময়ে ওরা দেশে আসতে পারে।

কিন্তু সে-বার চৈত্রমাসের অনেক আগেই দেশে ফিরলুম, ভণ্ডুলমামার সঙ্গে দেখার যোগাযোগ হয়ে উঠল না।

বছর তিনেক পরে। দোলের সময়। মামার বাড়ি দোলের মেলা খুব বিখ্যাত, নানা জায়গা থেকে দোকানপসারের আমদানি হয়। আমি মায়ের কাছে আবদার সুরু করলুম, এবার আমি একা রেলে চড়ে মেলা দেখতে যাব মামার বাড়ি। আমায় একা ছেড়ে দিতে বাবার ভয়ানক আপত্তি, অবশেষে অনেক কান্নাকাটির পরে তাঁকে রাজি করানো গেল। সারাপথ সে কি আনন্দ! একা টিকিট ক'রে, রেলে চড়ে, মামার বাড়ি চলেচি। জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম একা বাড়ির বার হয়েচি সেই আনন্দেই সারাপথ আত্মহারা!

কিন্তু এ সুখ সইল না। মামার বাড়ির ষ্টেশনে নেমেই কি রকমে হোঁচট খেয়ে প্লাটফর্ম্মের কাঁকরের উপর পড়ে গিয়ে আমার হাঁটু ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। অতি কষ্টে মামার বাড়ি পৌঁছে বিছানা নিলুম। পরদিন সকালে উঠতে গিয়ে দেখি আর উঠতে পারিনে—দুই হাঁটুই বেজায় টাটিয়েচে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর। কোথা দিয়ে দোল কেটে গেল টেরও পেলুম না। দিদিমাকে অনুরোধ করলুম, বাড়িতে যেন তাঁরা চিঠি না লেখেন যে আমি আসবার সময় ষ্টেশনে পড়ে গিয়ে হাঁটু কেটে ফেলেছি।

সেরে উঠে বেড়াতে বেরিয়ে একদিন দেখি ভণ্ডুলমামার বাড়িটা অনেক দুর গাঁথা হয়ে গেছে। কাঠ-থামাল পর্য্যন্ত গাঁথা হয়েছে, কিন্তু কড়ি এখনও বসানো হয়নি।

হঠাৎ এত খুশী হয়ে উঠলুম যে আছাড় খেয়ে হাঁটু কাটার কথা টের পেলে বাবা কি বল্‌বেন, তখনকার মত সে দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে গেল। উৎসাহে ও কৌতূহলে এক দৌড়ে ভণ্ডুলমামার বাড়িতে গিয়ে হাজির। গাঁথুনি অনেক দিন বন্ধ আছে মনে হ'ল, গত বর্ষার পরে বোধ হয় আর মিস্ত্রি আসে নি। ঘরের মেজেতে খুব জঙ্গল গজিয়েচে, গাঁথুনির ফাঁকে ফাঁকে আমরুল শাকের গাছ; বাড়ির উঠোনে বড একটা সজনে গাছে প্রথম ফাগুনে ফুলের খই ফুটেচে। ঘুরে ঘুরে দেখলুম, ভণ্ডুলমামার বাড়িতে তিনটে ঘর, একটা ছোট দালান, মাঝে একটা সিঁড়ির ঘর, আট-দশ ধাপ সিঁড়ি গাঁথা হয়ে গেছে। ওদিকের বড় ঘরটা বোধ হয় ভণ্ডুলমামার, মাঝের ঘরটাতে ছেলেমেয়েরা থাক্‌বে। ভণ্ডুল-মামাব বাপ আছে? কে জানে? তিনি বোধ হয় থাক্‌বেন সিঁড়ির এপাশের ঘরটাতে। রান্নাঘর কোথায় হবে? বোধ হয় উঠোনের এক পাশে ওই সজনে গাছটার তলায়। ভণ্ডুলমামা ছেলেমেয়ে নিয়ে যখন এসে বাস করবে, তখন এদের উঠোনে কি আর এমন জঙ্গল থাকবে? ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি ক'রে খেলবে, হয়ত বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে পুর্ণিমায় কি সংক্রান্তিতে সংক্রান্তিতে। পুকুর পাড়ের এ জংলী চেহারা তখন একেবারে বদলে যাবে যে! আমার মামার বাড়ির এ পাড়াতে এক ঘর লোক বাড়বে···ও-পাড়া থেকে খেলা ক'রে ফেরবার পথে সন্ধ্যে হয়ে গেলেও আর ভাবনা থাকবে না···ওদের বাড়িতে আলো জ্বলবে, ছেলেমেয়েরা কথা বল্‌বে, কিসের আর তখন ভয়? দিব্যি চলে যাব।

আরও বছর দুই কেটে গেল। থার্ড ক্লাসে পড়ি। মামার বাড়ি

একাই গেলুম। একাই এখন সব জায়গায় যাই। ভণ্ডুলমামার বাড়ির ছাদ-পেটানো হয়ে গিয়েছে, সিমেণ্টের মেজে, দালানের বাইরে রোয়াক্ হয়েছে কবে আমি দেখিনি তো? রোয়াকের ওপর কেমন টিনের ঢালু ছাদ! কেবল একটুখানি এখনও বাকী, দরজা জানালায় এখনও কপাট বসানো হয়নি। বাঃ, ভণ্ডুলমামার বাড়ি তাহলে হয়ে গেল!

ভণ্ডুলমামা নাকি আজকাল বড় সুদখোর হয়ে উঠেছেন, মাঝে মাঝে গাঁয়ে আসেন, চড়া সুদে লোকজনকে টাকা ধার দেন, বাড়ি দেখাশুনো করেন, আবার চলে যান। মাস-কতক পরে আবার এসে কাবুলীওয়ালার মত চড়াও হয়ে সুদ আদায় করেন। গাঁয়ের লোক তাঁর নাম রেখেচে রক্তদন্ত।

তারপর এল একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান। ছেলেবেলার মত মামার বাড়িতে আর তত যাইনে, গেলেও এক-আধ দিন থাকি। সেই এক-আধ দিনের মধ্যে পথে যেতে যেতে হয়ত দেখি, জঙ্গলের মধ্যে ভণ্ডুল-মামার বাড়িটা তেমনি জনহীন পড়ে আছে···বনজঙ্গল চারিপাশে আরও গভীরতর, কেউ কোনদিন ও-বাড়িতে পা দিয়েচে ব'লে মনে হয় না··· একটা ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া চেহারা, শীতের সন্ধ্যায় বর্ষার দিনে, চৈত্র-বৈশাখের দুপুরে কত বার ও-বাড়িটা দেখেচি, সেই একই মূর্ত্তি···

এম্নি ক'রে বছর কয়েক কেটে গেল।

ক্রমে এণ্ট্রেন্স পাস দিয়ে কলকাতায় এসে কলেজে ঢুকলুম। সেবার সেকেণ্ড ইয়ারের শেষ, এফ-এ দেব, কি একটা দরকারে মামার বাড়ি গিয়েচি।

বোধ করি মাঘ মাসের শেষ। দুপুরে পূবের ঘরে জানালার ধারে

খাটে শুয়ে আছি, বোধ হয় একখানা লজিকের বই পড়চি এমন সময়ে একজন কালো, শীর্ণকায় প্রৌঢ় লোক ঘরে ঢুকলেন। বড় মামীমা বললেন···এই তোর ভণ্ডুলমামা, প্রণাম কর্।

আমার সে ছেলেবেলাকার মনের অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল বয়স হয়েছে, কলেজে পড়ি; নানা ধরণের লোকের সঙ্গে মিশেছি, স্নুরেন বাঁড়ুয্যে ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনেছি, স্বদেশী মিটিঙে ভলাণ্টিয়ারী করেছি, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীই গেছে বদ্‌লে—তখন মনের কোন্ গভীর তলদেশে আরও পাঁচটা পুরোণো দিনের আদর্শেরও কৌতূহলের বস্তুর স্তূপের সঙ্গে ভণ্ডুলমামা ও তাঁর বাড়িও চাপা পড়ে গিয়েছে। তাই ঈষৎ অবজ্ঞামিশ্রিত চোখে সামান্য একটু কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখলুম মাত্র—ভণ্ডুলমামার বয়স পঞ্চাশের ওপর হবে, টিকিতে একটা মাদুলী বাঁধা, গলায় কিসের মালা, কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ি। এই সেই ছেলেবেলাকার ভণ্ডুলমামা! উদাসীন ভাবে প্রণামটা সেরে ফেললুম।

ভণ্ডুলমামা কিন্তু আমার সঙ্গে খুব আলাপ করলেন, একটু গায়ে পড়েই যেন। আমি কোন্ কলেজে পড়ি, কোন্ মেসে থাকি, কবে আমার পরীক্ষা ইত্যাদি নানা প্রশ্নে আমায় জ্বালাতন ক'রে তুললেন। আজকাল তিনি কল্‌কাতায় চাকরি করেন বাগবাজারে বাসা, তাঁর বড়ছেলেও এবার ম্যাট্রিক দিয়ে ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ছে—এ-সব খবরও দিলেন।

আমি জিগ্যেস্ করলুম,—আপনাদের এখানকার বাড়িতে ছেলেমেয়ে আন্‌বেন না?

ভণ্ডুলমামা বল্‌লেন,—আন্‌ব, শিগ্‌গীরই আন্‌ব বাবা। এখনও একটু বাকী আছে, একটা রান্নাঘর আর একটা কূয়ো—এ দুটো করতে পারলেই সব এনে ফেলি। কল্‌কাতায় বাসাভাড়া আর দুধের খরচ যোগাতেই··· সেইজন্যেই তো খেয়ে-না-খেয়ে দেশে বাড়িটা কর্‌লুম, তবে ঐ একটুখানি যা বাকী আছে···তা ছাড়া চিলেকোঠার ছাদটা এখনও···এইবারেই ভাবছি শ্রাবণ মাসের দিকে ওটাও শেষ করব।

বলে কি! এখনও বাকী! জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দেখে আস্‌ছি ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে! এ তাজমহল নির্ম্মাণের শেষ বেঁচে থেকে দেখে যেতে পারব তো!

ভণ্ডুলমামা আপন মনেই ব'লে যেতে লাগলেন—সামান্য চাকরি, ছা-পোষা মানুষ বাবা, কাচ্চাবাচ্চা খাইয়ে যা থাকে তাতেই তো বাড়ি হবে? এখন ত বাসায় বাসায় কাটচে, আজ যদি চাকরি যায় তবে ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব, তাই ভেবে আজ চোদ্দ-পনেরো বছর ধ'রে একটু একটু ক'রে বাড়িটা তুল্‌চি। তা এইবার আর দেরি হবে না, আস্‌ছে বছর সব এনে ফেল্‌ব। জায়গাটা বড় ভালবাসি।

ভণ্ডুলমামা বল্‌লেন ত চোদ্দ-পনেরো বছর, কিন্তু আমার মনে হ'ল ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধ'রে···যেন অনন্তকাল, অনন্ত যুগ ধ'রে ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইট একখানির পর আর একখানি উঠছে···শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্মমৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্ত্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে

ভঙুলমামার বাড়ি হয়েই চলেছে···ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।

পরের বছর আবার ভঙুলমামার সঙ্গে কল্‌কাতাতেই দেখা। আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। ভঙুলমামা বল্‌লেন—এস একবার আমাদের বাসায়। তোমার মামী তোমায় দেখলে খুশী হবে। সাম্‌নের রবিবার তোমার নেমন্তন রইল, অবিশ্যি অবিশ্যি যাবে।

গেলুম, ভঙুলমামার ছেলেদের সঙ্গেও আলাপ হ'ল। ভঙুলমামা অনুযোগের সুরে বললেন, ওদের বলি, যা একবার এই সময়ে। আষাঢ় মাসে দেশে গিয়ে উঠোনে খাসা বরবটি আর সিম লাগিয়ে রেখে এসেছি, মাচাও বেঁধে রেখে এসেছি তা কেউ কি কথা শোনে?

মামীমা ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলেন,—যাবে সেখানে কেমন ক'রে শুনি? কোনো ঘরে বাস করবার জো নেই, ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ে। জলের ব্যবস্থা নেই বাড়িতে, শুধু সিম আর বরবটির পাতা চিবিয়ে ত মানুষে···তাতে বাড়ি হাট আলগা, পাঁচিল নেই।

ভঙুলমামা মৃদু প্রতিবাদের সুরে ভয়ে ভয়ে যা বললেন তার মর্ম্ম এই যে, মানুষ বাস না করলেই বাড়িতে বটঅশথের গাছ হয়, ছাদ আঁটা হয়ে গেছে আজ অনেক দিন, কিন্তু কেউ বাস ত করে না। বাড়ি কাজেই খারাপ হয়ে থাকে। তবুও তিনি বছরে দু-তিনবার যান ব'লে এখনও ঘরদোর টিকে আছে। পাতকুয়োর আর কত খরচ? চৈত্র মাসের দিকে না হয় ক'রে দেওয়া যাবে। আর তোমরা সবাই যদি যাও, পাঁচিল আষাঢ় মাসেই ক'রে দেওয়া যাবে।

বুঝলুম পাঁচিল পাতকুয়া এখনও বাকী। ভঙুলমামার বাড়ি এখনও

শেষ হয়নি, এখনও কিছু বাকী আছে। কিন্তু এতদিন ধ'রে ব্যাপারটা চলচে যে এক দিক গড়ে উঠতে অন্য দিকে ধরেছে ভাঙন।

এর পরে মামার বাড়ি গিয়ে দু-একবার দেখেছি ভণ্ডুলমামা দু-পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে আছেন। এটা সারাচ্ছেন, ওটাতে বেড়া বাঁধছেন, এ-গাছটা খুঁড়ছেন, ও-গাছটা কাটছেন। ছেলেরা আস্‌তে চায় না কল্‌কাতা ছেড়ে। নিজেকেই আস্‌তে হয়, দেখাশুনো করতে হয় ব'লে একদিন সলজ্জ কৈফিয়ৎ ও দিলেন।···পাঁচিল? হ্যাঁ তা পাঁচিল—সম্প্রতি একটু টানাটানি যাচ্ছে···সাম্‌নের বর্ষায়···ঘরদোর বেঁধেছি সারাজীবন খেটে, ওই আমার বড় আদরের জায়গা—তোরা না থাকিস, আমিই গিয়ে থাকি।

আমি বল্‌লুম,—ওখানে কেমন ক'রে থাকেন? সারা গাঁয়েই ত মানুষ নেই, মামার বাড়ির পাড়া ত একেবারে জনশূন্য হয়ে গেছে।

—কি করি বাবা, ওই বাড়িখানার ওপর বড় দম আমার যে। দেখ, চিরকাল পরের বাসায়, পরের বাড়িতে মানুষ হয়ে ঘরের কষ্ট বড় পেয়েছিলুম—তাই ঠিক করি বাড়ি একখানা করবই। ছেলেবেলা থেকে ওই গাঁয়েই কাটিয়েছি, ওখানটা ছাড়া আর কোথাও মন বসে না। চিরকাল ভাবতুম রিটায়ার ক'রে ওখানেই বাস করব। একটা আস্তানা ত চাই, এখন না হয় ছেলেপিলে নিয়ে বাসায় বাসায় ঘুরছি, কিন্তু এর পরে দাঁড়াব কোথায়? তাই জলাহার ক'রেও সারাজীবন কিছু কিছু সঞ্চয় ক'রে ওই বাড়িখানা করেছিলুম। তা ওরা তো কেউ এল না—আমি নিজেই থাকি। না থাকলে বাড়িখানা ত থাকবে না—আর

এককালে না-এককালে ছেলেদের ত এসে বস্‌তেই হবে বাড়িতে। কল্‌কাতার বাসায় বাসায় ত চিরকাল কাটবে না।

তারপর মামাদের, মুখে ভণ্ডুলমামার কথা আরও সব জানা গেল। ভণ্ডুলমামা একা বিজন বনের মধ্যে নিজের বাড়িখানায় থাকেন। তাঁর এখনও দৃঢ়বিশ্বাস তাঁর ছেলেরা শেষ পর্য্যন্ত ওই বাড়িতেই গিয়ে বাস করবে। তিনি এখনও এ-জায়গাটা ভাঙছেন, ওটা গড়ছেন, নিজের হাতে দা দিয়ে জঙ্গল সাফ করছেন। ছেলেদের সঙ্গে বনে না—ওই বাড়ির দরুণই মনান্তর, স্ত্রীও ছেলেদের দিকে। ছেলেরা বাপকে সাহায্যও করে না। ভণ্ডুলমামা গাঁয়ে একখানা ছোট মুদির দোকান করেছিলেন—লোক নেই তার কিনবে কে? যা দু-একঘর খদ্দের জুটেছিল—ধার নিয়েই দোকান উঠিয়ে দিলে। এখন ভণ্ডুলমামা এ-গাঁ ওগাঁ বেড়িয়ে কোনো চাষার বাড়ি থেকে দু-কাঠা চাল, কারুর বাড়ির পাঁচটা বেগুন—এই রকম ক'রে চেয়েচিন্তে এনে বাড়িতে হাঁড়ি চড়িয়ে দুটো ফুটিয়ে খান।

তারপর ধীরে ধীরে অনেক বছর কেটে গেল। আমি ক্রমে বি-এ পাস করে চাকরিতে ঢুকলুম। মামার বাড়ি আর যাইনে, কারণ সে-গ্রাম আর যাবার যোগ্য নেই। মামার বাড়ির পাড়ায় গাঙুলীরা, রায়েরা, ভড়েরা সব একে একে মরে হেজে গেল, যারা অবশিষ্ট রইল তারা বিদেশে চাকরি করে, ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রামের ত্রিসীমানা মাড়ায় না। ও-পাড়াতেও তাই জীবন মজুমদারের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি ছাদ ভেঙে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছে, শুধু এক দিকের দোতলাসমান দেয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে। যে পূজোর দালানে ছেলেবেলায় কত উৎসব দেখেছি, এখন

সেখানে বড় বড় জগডুমুরের গাছ, দিনেই বোধ হয় বাঘ লুকিয়ে থাকে। বিখ্যাত রায়দীঘি মজে গিয়েছে, দামে বোঝাই, জল দেখা যায় না, গরুবাছুর কচুরীপানায় দামের ওপর দিয়ে হেঁটে দিব্যি পার হ'তে পারে।

সন্ধ্যা রাতেই গ্রাম নিশুতি হয়ে যায়। দু-এক ঘর নিরুপায় গৃহস্থ যারা নিতান্ত অর্থাভাবে এখনও পৈতৃক ভিটেতে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ হাতে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাচ্ছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'তে-না-হতেই তারা প্রদীপ নিবিয়ে শয্যা আশ্রয় করে—তারপর সারারাত ধ'রে চারিধারে শুধু প্রহরে প্রহরে শৃগালের রব ও নৈশপাখীর ডানা ঝটাপটি!

আমার মামারাও গ্রামের ঘর-বাড়ি ছেড়ে শহরে বাসা করেছেন। ছোটমামার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে সেখানে একবার গিয়েছি। ব্রাহ্মণভোজনের কিছু আগে একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ একটা পুঁটুলি-হাতে বাড়িতে ঢুকলেন। এক পা ধূলো, বগলে একটা ময়লা সাদা কাপড়-বসানো বাঁশের বাঁটের ছাতা। প্রথমটা চিনতে পারিনি। পরে বুঝলুম ভণ্ডুলমামা। ভণ্ডুলমামা এত বুড়ো হয়ে পড়েছেন এর মধ্যে!··· শহরে এসে মামাদের নতুন সভ্য, সৌখীন আলাপী বন্ধুবান্ধব জুটেছে, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদের ধরণে ও কথাবার্ত্তার সুরে ভণ্ডুলমামা কেমন ভয় খেয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের সতরঞ্চির এককোণে বসলেন। তিনিও নিমন্ত্রিত হয়েই এসেছিলেন বটে, কিন্তু মামারা তখন শহুরে বন্ধুদের আদর-অভ্যর্থনায় মহা ব্যস্ত; তাঁর আগমন কেউ বিশেষ লক্ষ্য করেছে এমন মনে হ'ল না।

আমি গিয়ে ভণ্ডুলমামার কাছে বসলুম। চারিধারে অচেনা মুখের

মধ্যে আমায় দেখে ভণ্ডুলমামা খুব খুশী হলেন। আমি জিগ্যেস করলুম—আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন ?

ভণ্ডুলমামা বললেন,—না বাবা, আমি রিটায়ার করেছি আজ বছর-পাঁচেক হবে। গাঁয়ের বাড়িতেই আছি। ছেলেরা কেউ আসতে চায় না।

অন্নপ্রাশন শেষ হয়ে গেল। ভণ্ডুলমামা কিন্তু মামার বাঁড়ি থেকে আর নড়তে চান না। চার-পাঁচ দিন পরে কিছু চাল-ডাল ও বাসি সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে দেশে রওনা হলেন। পায়ে দেখি কটক থেকে কিনে-আনা বড় মামার সেই পুরোনো চটি জুতো জোড়া। আমায় দেখিয়ে বললেন,—নবীন কটক থেকে এনেছে, দেখে বড় সখ হ'ল, বয়েস হয়েছে কবে মরে যাব, বল্লুম তা দাও নবীন, জুতোজোড়াটা পুরোণো হ'লেও এখনও দু-তিন মাস যাবে। বাড়িতে একজোড়া রয়েছে, আঙুলে বড় লাগে ব'লে খালি পায়েই—

তিনি বাড়ির বার হয়ে গেলেন। আমি চেয়ে চেয়ে দেখলুম শীর্ণকায় ভণ্ডুলমামা ভারী চাল ডালের মোটের ভারে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে চটিজুতোর ফটাং ফটাং শব্দ করতে করতে ষ্টেশনের পথে চলেছেন। হঠাৎ আমার মনে তাঁর উপরে আমার বাল্যের সেই রহস্যময় স্নেহ ও অনুকম্পার অনুভূতিটুকু কতকাল পরে আবার যেন ফিরে এল। আমি চেঁচিয়ে বললুম—একটু দাঁড়ান, মামা, আপনাকে তুলে দিয়ে আসি। ভণ্ডুলমামার পুঁটুলিটা নিজের হাতে নিলুম, টিকিট ক'রে তাঁকে গাড়ীতে তুলেও দিলুম। ট্রেনে ওঠবার সময় একমুখ হেসে বললেন—যেও না হে একদিন, বাড়িটা দেখে এস আমার—খাসা

করেছি—কেবল পাঁচিলটা এখনও যা বাকি। কি করি, আমার হাতে আজকাল আর ত কিছু নেই, ছেলেরা নিজেদের বাসার খরচই চালিয়ে উঠতে পারে না—অবিশ্যি ওদের জন্যেই ত সব দেখি, চেষ্টায় আছি—

সামনের বছরে যদি···

ভণ্ডুলমামার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। কিন্তু এর মাস-কতক পরে তাঁর বড়ছেলে হরিসাধনের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়েছিল। ম্যাকমিলান কোম্পানীর বাড়িতে চাকরি করে, জিনের কোট গায়ে, হাতে বইয়ের আকারের খাবারের কৌটো, মুখে একগাল পান—বৌবাজারের ফুটপাথ দিয়ে বেলা দশটার সময় আপিসে যাচ্ছে। আমিই ভণ্ডুলমামার কথা তুললুম। হরিসাধন বললে—বাবা দেশের বাড়িতেই আছেন—আমরা বলি আমাদের সংসারে এসে থাকুন, তাতে রাজি নন। বুদ্ধিশুদ্ধি ত কিছু ছিল না বাবার, নেইও—সারা জীবন যা রোজগার করেছেন ওই জঙ্গলের মধ্যে এক বাড়ি করতে গিয়ে সব নষ্ট করেছেন, নইলে আজ হাজার চার-পাঁচ টাকা হাতে জম্‌তো। ও-গাঁয়ে যাবেই বা কে? রামোঃ, যেমন জঙ্গল্ তেম্‌নি ম্যালেরিয়া—তাছাড়া লোকজন নেই, অসুখ হ'লে একটা ডাক্তার নেই—চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে বাড়ির পিছনে, বেচতে গেলে এখন ইট কাঠের দরেও বিক্রী হবে ভেবেছেন? কে নিতে যাবে, পাগল আপনি?

আমি বললুম—কথাটা ঠিক্ বটে। কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার বাবা যখন বাড়িটা প্রথম আরম্ভ করেছিলেন, তখন জাজ্বল্যমান গ্রাম। বাড়িটা তৈরী করতে এত দেরি হয়ে গেল যে ইতিমধ্যে গাঁ হয়ে গেল শ্মশান,

২

লোকজন উঠে অন্যত্র চলে গেল, আর সেই সময় তোমাদের বাড়ির গাঁথুনিও শেষ হ'ল। কার দোষ দেবে?

তারপরে ভণ্ডুলমামার আর কোন সংবাদ রাখিনি অনেক কাল। বছর-তিনেক আগে একবার মেজমামা চেঞ্জে গিয়েছিলেন দেওঘরে। পূজোর ছুটিতে আমিও সেখানে যাই। তাঁর মুখেই শুনলুম ভণ্ডুলমামা সেই শ্রাবণেই মারা গিয়েছেন। অসুখ-বিসুখ হয়ে ক'দিন ঘরের মধ্যেই ছিলেন, কেউ বিশেষ দেখাশুনা করেনি, আর আছেই বা কে গাঁয়ে যে দেখবে? এ অবস্থায় ঘরের মধ্যে ম'রে পড়েছিলেন, দু-তিন দিন পরে সবাই টের পায়, তখন ছেলেদের টেলিগ্রাম করা হ'ল। ভণ্ডুলমামার এইখানেই শেষ।

এর পর আমি আর কখনও মামার বাড়ির গ্রামে যাইনি. হয়ত আর কোন দিন যাবও না, বাড়িটাও আর দেখিনি, কিন্তু জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত যে বাড়িটা গাঁথা হ'তে দেখেছি, সেটা আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার ক'রে আছে। আমার কল্পনায় দেশের মামার বাড়ির গ্রামের, একগলা বনের মধ্যে শীতের দিনের সন্ধ্যায় ভণ্ডুলমামার বাড়িটা একটা কায়াহীন, অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন রূপ নিয়ে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে…সেই গাছ-গজানো উঠোনটাতে ঢোকবার পথ বনে ঢাকা, দরজা জানালার কপাট নেই থামে থামে কাঠ-থামাল পর্য্যন্ত গাঁথা হয়েছে।…

আমার জীবনের সঙ্গে ভণ্ডুলমামার বাড়িটার এমন যোগ কি ক'রে ঘটল, সেটা আজ ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাই—আমার গল্পের আসল কথাই তাই। অমন একটা সাধারণ জিনিষ কেন আমার মন এমন জুড়ে বসে রইল, অথচ কত বড় বড় ঘটনা তো বেমালুম মন থেকে মুছেই গিয়েছে!

বিশেষ ক'রে এই সব শীতের সন্ধ্যাতেই মনে পড়ে এইজন্যে, যে পাঁচ বছর বয়সে এই শীতের সন্ধ্যাবেলাতেই বাড়িটা প্রথম দেখি।

* * * *

অবিনাশবাবুর ছাত্রটি মুড়ি নিয়ে এল।

পেয়ালা

সামান্য জিনিষ। আনা তিনেক দামের কলাই-করা চায়ের ডিস্-পেয়ালা।

যেদিন প্রথম আমাদের বাড়ীতে ওটা ঢুক্‌ল, সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। শীতকাল, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে লেপের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করচি, এমন সময় কাকার গলার স্বর শুনে দালানের দিকে গেলাম। কাকা গিয়েছিলেন দোকান নিয়ে কুলবেড়ের মেলায়। নিশ্চয়ই ভাল বিক্রী-সিক্রী হয়েছে!

উঠোনে দুখানা গরুর গাড়ী। কৃষাণ হরু মাইতি একটা লেপ-তোষকের বাণ্ডিল নামাচ্ছে। একটা নতুন ধামায় একরাশ সংসারের জিনিষ,—বেলুন, বেড়ী, খুন্তী, ঝাঁঝরি, হাতা। খান কতক নতুন মাদুর, গোটা দুই কাঁটাল কাঠের নতুন জলচৌকি। এক বোঝা পালং-শাকের গোড়া, দু ভাঁড় খেজুরে গুড়, আরও সব কি কি।

কাকা আমায় দেখে বললেন—নিবু একটা লণ্ঠন নিয়ে আয়—এটায় তেল নেই।

আমি এক দৌড়ে রান্নাঘরের লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে এলাম। পিসিমা হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন, কিন্তু তখন কে কথা শোনে?

কাকাকে জিগ্যেস করলাম—মেলায় এবার লোকজন কেমন হ'ল কাকা?

কাকা বললেন—লোকজন প্রথমটা মন্দ হয় নি, কিন্তু হঠাৎ কলেরা, সুরু হয়ে গেল, ওই তো হ'ল মুস্কিল! সব পালাতে লাগ্‌ল, বাঁওড়ের

জলে রোজ পাঁচটা-ছ'টা মড়া ফেল্‌ছিল, পুলিস এসে বন্ধ ক'রে দিলে, খাবারের যত দোকান ছিল সব উঠিয়ে দিলে, কিছুতেই কিছু হয় না, ক্রমেই বেড়ে চলল। শেষে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলাম। বিক্রী-সিক্রী কাঁচকলা, এখন খোরাকী, গাড়ী ভাড়া উঠলে বেঁচে যাই।

খেতে বসে কাকা মেলার গল্প করছিলেন, বাড়ির সবাই সেখানে ব'সে। কি রকম ক'রে প্রথমে কলেরা আরম্ভ হল, কত লোক মারা গেল, এই সব কথা।

—আহা সাম্‌টা মানপুর থেকে কে একজন যদু চক্কোতি, না, কি নাম—একখান ছইএ গাড়ী পুরে বাড়ির লোক নিয়ে এসেচে মেলা দেখতে। ছেলেমেয়ে, বৌ-ঝি, সে একেবারে গাড়ী বোঝাই। বাঁওড়ের ধারের তালতলায় গাড়ী রেখে সেখানেই সব রেঁধে খায়-দায়, থাকে। দু-দিন পরে রাত পোয়ালে বাড়ি ফিরবে, রাত্রিরেই ধরল তাদের একটা ন-বছরের মেয়েকে কলেরায়। কোথায় ডাক্তার, কোথায় ওষুধ, সকাল দশটায় সেটা গেল তো ধরল তার মাকে। রাত আটটায় মা গেল তো ধরল বড় ছেলের বৌকে। তখন এদিকেও রোগ জেঁকে উঠেচে, কে কাকে ছাখে—তারপর সে যা কাণ্ড। এক-একটা ক'রে মরে, আর পাশেই বাঁওড়ের জলে ফেলে—আদ্ধেক গাড়ী খালি হয়ে গেল। ব্রাহ্মণের যা সর্ব্বনাশ ঘটল আমাদের চোখের সাম্‌নে, উঃ!

কাকা ভূষি মালের ব্যবসা করেন। প্রায় চল্লিশ মণ সোনামুগ মেলায় বিক্রীর জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন, মণ বারো, না তেরো কাটাতে পেরেছিলেন, বাকী গরুর গাড়ীতে ফিরে আসচে, কাল সকাল নাগাৎ পৌঁছুবে। গাড়ীতে আছে আমাদের আড়তের সরকার হরিবিলাস মান্না।

খেয়ে কাকা উঠে যাবার একটু পরেই কাকার ছোট মেয়ে মনু একটা কলাই-করা পেয়ালা রান্নাঘরে নিয়ে এসে বল্লে, এই ছাখো জ্যাঠাই-মা, বাবা এনেচেন, কাল আমি এতে চা খাব কিন্তু। হাতে তুলে সকলকে দেখিয়ে বল্লে—বেশ, কেমন, না? মেলায় তিন আনা দরে কেনা—

এই প্রথম আমি দেখলুম পেয়ালাটা।

সে আজ চার বছরের কথা হবে।

তারপর বছর দুই কেটে গেল। আমি কাজ শিখে এখন টিউব ওয়েলের ব্যবসা করি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের কাজ সংগ্রহ করবার জন্যে এখানে ওখানে বড় ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে হয়; বাড়িতে বেশীক্ষণ থাকা আজকাল আর বড় ঘটে না।

সেদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে কলকাতা আসব, আমার বিছানাপত্র বেঁধে রান্নাঘরে চায়ের জন্যে তাগাদা দিতে গিয়েছি কানে গেল আমার বড় ভাই-ঝি বলচে—ও পেয়ালাটাতে দিও না পিসিমা, বাবা মারা যাওয়ার পর মা ও পেয়ালাটাকে দেখতে পারে না দু চোখে—

আমি বল্লুম—কোন্ পেয়ালাটা রে? কি হয়েচে পেয়ালার?

আমার ভাই-ঝি পেয়ালা নিয়ে এল, মনে হ'ল কাকার কেনা অনেক দিনের সে পেয়ালাটা।

সে বল্লে—বৌদিদির অসুখের সময় এই পেয়ালাটা ক'রে দুধ খেতেন, তারপর বাবার সময়ও এতে ক'রে ওঁর মুখে সাবু ঢেলে দেয়া হত—মা বলে, আমি ওটা দেখতে পারিনে—

আমার এই জ্যাঠতুতো ভাইয়ের স্ত্রী কলকাতা থেকে, আমাদের

এখানে বেড়াতে এসে অসুখে পড়েন এবং তাতেই মারা যান। এর বছর দুই পরে কাকাও মারা যান পৃষ্ঠব্রণ রোগে। কিন্তু এর সঙ্গে পেয়ালাটার সম্পর্ক কি ? যত সব মেয়েলি কুসংস্কার !

পরের বছর থেকে আমার টিউব ওয়েলের কাজ খুব জেঁকে উঠল, জেলা বোর্ডের অনেক কাজ এল আমার হাতে। আমার নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই, দূর দূরান্তর পাড়াগাঁয়ের নানা স্থানে টিউব ওয়েল বসানো ও মিস্ত্রী খাটানোর কাজে মহা ব্যস্ত—বাকী সময়টুকু যায় আর বছরের বিলের টাকা আদায়ের তদ্বিরে।

সংসারেও আমাদের নানা গোলোযোগ বেধে গেল। কাকা যত দিন ছিলেন কেউ কোনো কথাটি বলতে সাহস করেনি সংসারের পুরানো ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে। এখন -সবাই হয়ে দাঁড়াল কর্ত্তা, কেউ কাউকে মেনে চল্‌তে চায় না।

ঠিক এই সময় আমার ছোট ছেলের ভয়ানক অসুখ হলো। আমার আবার সেই সময় কাজের ভিড় খুব বেশী। জেলা বোর্ডের কাজ শেষ হয়ে গিয়েচে, কিন্তু টাকার তাগাদা ক'রতে হবে ঠিক ওই সময়টাতে। নইলে বিল চাপা পড়তে পারে ছমাস বা সাত মাসের জন্যে। আমি আজ জেলা, কাল মহকুমা ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলুম, এ মেম্বর ও মেম্বরকে ধরি, যাতে আমার বিলের পাওনাটা চুকিয়ে দিতে তাঁরা সাহায্য করেন।

কাজ মিটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন এদিকেও কাজ মিটে গিয়েচে। ছেলেটি মারা গিয়েচে—অবিশ্যি চিকিৎসার ত্রুটি হয় নি কিছু, এই যা সান্ত্বনা।

বছরের শেষে আমি শহরে বাসা ক'রে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সেখানে নিয়ে এলাম। বাড়ির ওই সব দুর্ঘটনার পরে সেখানে আমাদের কারুর মন বসে না, তাছাড়া আমার ব্যবসা খুব জেঁকে উঠেচে—সর্ব্বদা শহরে না থাক্‌লে কাজের ক্ষতি হয়।

টিউব ওয়েলের ব্যবসাতে নেমে একটা জিনিষ আমার চোখে পড়েচে যে, আমাদের দেশের, বিশেষ ক'রে পাড়াগাঁয়ের, লোকেদের মত অলস প্রকৃতির জীব বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এত অল্পে সন্তুষ্ট মানুষ যে কি ক'রে হতে পারে সে যাঁরা এদের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের ধারণাতেও আসবে না। নিশ্চিত মৃত্যুকেও এরা পরম নিশ্চিন্তে বরণ ক'রে নেবে, সকল রকম দুঃখ দারিদ্র্য অসুবিধাকে সহ্য করবে কিন্তু তবু দু-পা এগিয়ে যদি এর কোন প্রতিকার হয় তাতে রাজী হবে না। তবে এদের একটা গুণ দেখেচি, কখন অভিযোগ করে না এরা, দেশের বিরুদ্ধেও না, দৈবের বিরুদ্ধেও না।

বাইরে থেকে এদের দেখে যাঁরা বল্‌বেন এরা মরে গিয়েচে, এরা জড় পদার্থমাত্র, ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখলে কিন্তু তাঁরা মত বদ্‌লাতে বাধ্য হবেন। এরা মরে নি, বোধ হয় মরবেও না কোন কালে। এদের জীবনীশক্তি এত অফুরন্ত যে, অহঃরহ মরণের সঙ্গে যুঝে এবং পদে পদে হেরে গিয়েও দমে যায় না এরা, বা ভয় পায় না, প্রতিকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না। সহজ ভাবেই সব মেনে নেয়, সব অবস্থা।

খারাপ বিলের পাটপচানো জল খেয়ে কলেরায় গ্রাম উৎসন্ন হয়ে থাকে, তবু এরা টিউব ওয়েলের জন্যে একখানা দরখাস্ত কখনও দেবে না বা তদ্বির করবে না। কে অত ছুটাছুটি করে, কেই বা কষ্ট করে?

শুধু একখানা দরখাস্ত করা মাত্র, অনেক সময় দরকার বুঝলে জেলা বোর্ড থেকে বিনা খরচায় টিউব ওয়েল বসিয়ে দেয়—কিন্তু ততটুকু হাঙ্গামা করতেও এরা রাজী নয়।

বাসায় একদিন বিকেলে চা খাওয়ার সময়ে লক্ষ্য করলুম, আমার ছোট মেয়েটি সেই কলাই করা পেয়ালাটা ক'রে চা খাচ্ছে।

যদিও ওসব মানিনে, তবুও আমার কি-জানি-কি মনের ভাব হল—চা খাওয়া-টাওয়া শেষ হয়ে গেলে পেয়ালাটা চুপি চুপি বাইরে নিয়ে গিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম পাঁচিলের ওধারের জঙ্গলের মধ্যে।

কাকার বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, ছোট মেয়েটির বয়স দশ বছর, খুব বুদ্ধিমতী। শহরের মেয়ে-স্কুলে লেখাপড়া শেখাব বলে ওকে বাসায় এনে রেখেছিলুম, স্কুলেও ভর্তি করে দিয়েছিলুম।

মাস পাঁচ-ছয় কাট্‌ল। বৈশাখ মাস।

এই সময়েই আমার টিউব ওয়েলের কাজের ধুম। আট দশ দিন একাদিক্রমে বাইরে কাটিয়ে বাসায় ফিরি কিন্তু তখনই আবার অন্য একটা কাজে বেরিয়ে যেতে হয়। এতে পয়সা রোজগার হয় বটে, কিন্তু স্বস্তি পাওয়া যায় না। স্ত্রীর হাতের সেবা পাইনে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গ পাইনে, শুধু টো টো ক'রে দূরদূরান্তর চাষাগাঁ ঘুরে ঘুরে বেড়ানো—শুধুই এষ্টিমেট কষা, বোরিং করা, মিস্ত্রী খাটানো। মানুষ চায় দু-দণ্ড আরামে থাক্‌তে, আপনার লোকেদের কাছে ব'সে তুচ্ছ বিষয়ে গল্প করতে, নিজের সাজানো ঘরটিতে খানিক্ষণ ক'রে কাটাতে, হয় তো একটু বসে ভাবতে, হয় তো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটু ছেলেমানুষি করতে—শুষ্ক টাকা রোজগারে এসব অভাব তো পূর্ণ হয় না?

পেয়ালা

হঠাৎ চিঠি পেয়ে বাসায় ফিরলাম, কাকার ছোট মেয়েটির খুব অসুখ।

আমি পৌঁছলাম দুপুরে, একটু পরে রোগীর ঘরে ঢুকে আমি থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলুম। আমার পিসিমা সেই কলাই-করা পেয়ালাটাতে রোগীকে সাবু না বার্লি খাওয়াচ্চেন।

আমি আমার মেয়েকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—ও পেয়ালাটা কোথা থেকে এল রে? খুকী বললে—ওটা কুকুরে না কিসে বনের মধ্যে নিয়ে ফেলেছিল বাবা, মনুদি দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছিল। সে ত অনেকদিনের কথা, পাঁচিলের বাইরে ওই যে বন, ওইখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি বিস্মিত সুরে জিজ্ঞেস্ করলুম—মনু নিয়ে এসেছিল? জানিস্ ঠিক তুই?

খুকী অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ বাবা, আমি খুব জানি। তুমি না হয় মাকে জিজ্ঞেস্ ক'রো আমাদের সেই যে ছোকরা চাকরটাকে কুকুরে কাম্‌ড়েছিল না, ওইদিন সকালে মনুদি পেয়ালাটা কুড়িয়ে আনে। ওই পেয়ালাতে তাকে কিসের শেকড়ের পাঁচন খাওয়ানো হ'ল আমার মনে নেই?

আমি চমকে উঠলুম, বললুম কাকে রে? রামলগনকে?

—হ্যাঁ বাবা, সেই যে তারপর এখান থেকে চলে গেল দেশ, সেই ছেলেটা।

আমার সারা গা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল—রামলগন কুকুরে কামড়ানোর পর দেশে চলে গিয়েছিল—কিন্তু সেখানে যে সে মারা গিয়েছে, এ খবর

আমি কাউকে বলিনি। বিশেষ ক'রে গৃহিণী তাকে খুব ভাল বাসতেন ব'লেই সংবাদটা আর বাসায় জানাই নি। আমাদের টিউবওয়েলের মিস্ত্রী শিউবরণের শালীর ছেলে সে—সেই খবরটা মাসখানেক আগে আমায় দেয়।

মন্নুর অসুখ তখনও পর্য্যন্ত খুব খারাপ ছিল না, ডাক্তারেরা বল্‌ছেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। আমার কিন্তু মনে হ'ল ও বাঁচবে না।

ও পেয়ালাটার ইতিহাস এ বাসায় আর কেউ জানে না, অসুখের সময় যে ওতে করে কিছু খেয়েচে সে আর ফেরেনি। জান্‌ত কেবল কাকার বড় মেয়ে, সে আছে শ্বশুরবাড়ি।

পেয়ালাটা একটু পরেই আবার চুপি চুপি ফেলে দিলুম—হাত দিয়ে তোলবার সময় তার স্পর্শে আমার সারা দেহ শিউরে উঠল—পেয়ালাটা যেন জীবন্ত, মনে হল যেন একটা ক্রুর, জীবন্ত বিষধর সাপের বাচ্চার গায়ে হাত দিয়েচি, যার স্পর্শে মৃত্যু...যার নিঃশ্বাসে মৃত্যু...

পরদিন দিন-দুপুর থেকে মন্নুর অসুখ বাঁকা পথ ধরলে, ন' দিনের দিন মারা গেল।

আমি জানতুম ও মারা যাবে।

মন্নুর মৃত্যুর পরে পেয়ালাটা আবার কুড়িয়ে এনে ব্যাগের মধ্যে পুরে কাজে বেরুবার সময় নিয়ে গেলুম। সাত-আট ক্রোশ দূরে একটা নির্জ্জন বিলের ধারে ফেলে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

শোকের প্রথম ঝাপ্‌টা কেটে গিয়ে মাস দুই পরে বাসা একটু ঠাণ্ডা হয়েচে তখন। কথায় কথায় স্ত্রীর কাছে একদিন এমনি পেয়ালাটার কথা বলি। তিনি আমার গল্প শুনে যেন কেমন হয়ে গেলেন, কেমন

এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চয়ে রইলেন, মুখ দিয়ে তাঁর কথা বেরুল না। আমি বললুম—বোধ হয় অত খেয়াল ক'রে তুমি কখন দ্যাখোনি, তাই ধরতে পারনি—আমি কিন্তু বরাবর –

আমার স্ত্রী বিবর্ণমুখে বললেন—বলব একটা কথা ? আমার আজ মনে পড়ল—একটু চুপ করে থেকে বললেন—

—খোকা যখন মারা যায় আর বছর আষাঢ় মাসে, সেই কলাই করা পেয়ালাটাতে তাকে ডাবের জল খাওয়াতুম। আমি নিজের হাতে কত বার খাইয়েচি। তুমি তো তখন বাইরে বাইরে ঘুরতে, তুমি জানো না।

আমার কোনো উত্তর খানিকক্ষণ না পেয়ে বললেন, জান্‌তে তুমি একথাটা ?

—না, জানতুম না অবিশ্যি। কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে আর একটা কথা মনে তোলাপাড়া করছিলুম—পেয়ালাটা আমাদের ছেড়েচে ত ? ওটাকে কেন তখন ভেঙে চুরমার করে নষ্ট ক'রে দিই নি ? আবার কোনো উপায়ে এসে এ বাড়িতে ঢুকবে না ত ?

উইলের খেয়াল

দেশ থেকে রবিবারে ফিরছিলাম কল্‌কাতায়। সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নেই, একটু আগে থেকেই প্লাটফর্ম্মে আলো জেলেচে, শীতও খুব বেশী। এদিকে এমন একটা কাম্‌রায় উঠে বসেচি, যেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই যার সঙ্গে একটু গল্পগুজব করি। আবার যার তার সঙ্গে গল্প ক'রেও আনন্দ হয় না। আমার দরের কোনো লোকের সঙ্গে গল্প করে কোনো সুখ পাইনে, কারণ তারা যে কথা বল্‌বে সে আমার জানা। তারা আমারই জগতের লোক, আমার মতই লেখাপড়া তাদেরও, আমারই মত কেরাণীগিরি কি ইস্কুল মাষ্টারী করে, আমারই মত শনিবারে বাড়ি এসে আবার রবিবারে কল্‌কাতায় ফেরে। তারা নতুন খবর আমায় কিছুই দিতে পারবে না, সেই এক-ঘেয়ে কল্‌কাতার মাছের দর, এম্, সি সি'র খেলা, ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটির দোকানে শীতবস্ত্রের দাম, চণ্ডীদাস কি সাবিত্রী ফিলমের সমালোচনা—এসব শুনলে গা বমি-বমি করে। বরং বেগুনের ব্যাপারী, কি কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোক, কি দোকানদার—এদের ঠিকমত বেছে নিতে পারলে, কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু বেছে নেওয়া বড় কঠিন—কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক ভেবে যাঁর কাছে গিয়েছি, অনেক সময় দেখেছি তিনি ইন্‌সিওরেন্সের দালাল।

একা বসে বিড়ি খেতে খেতে প্লাটফর্ম্মের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় দেখি, আমার বাল্যবন্ধু শান্তিরাম হাতে একটা ভারী বোঁচকা ঝুলিয়ে কোন্ গাড়ীতে উঠবে ব্যস্তভাবে খুঁজে বেড়াচ্চে। আমি ডাকতেই

'এই যে!' ব'লে একগাল হেসে আমার কামরার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—বোঁচকাটা একটুখানি ধর না ভাই কাইগুলি—

আমি তার বোঁচকাটা হাত বাড়িয়ে গাড়ীতে তুলে নিলাম—পেছনে পেছনে শান্তিরাম ও হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে আমার সামনের বেঞ্চিতে মুখোমুখি হয়ে বস্‌লো। খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বল্‌লে—বিড়ি আছে? কিন্‌তে ভুলে গেলাম তাড়াতাড়িতে। আর ক'মিনিট আছে? পৌনে ছ'টা না রেলওয়ে? আমি ছুট্‌চি সেই বাজার থেকে—আর ঐ ভারী বোঁচকা! প্রাণ একেবারে বেরিয়ে গিয়েচে। কল্‌কাতায় বাসা করা গিয়েচে ভাই, শনিবারে শনিবারে বাড়ি আসি। বাগানের কলাটা, মূলোটা যা পাই নিয়ে যাই এসে—সেখানে তো সবই—হুঁ—হুঁ—বুঝলে না? দাঁতন-কাঠিটা এস্তেক তাও নগদ পয়সা। প্রায় তিন-চার দিনের বাজার খরচ বেঁচে যায়। এই দ্যাখো, ওল, পুঁই শাক, কাঁচা লঙ্কা, পাটালি···দেখি দেশলাইটা—শান্তিরামকে পেয়ে খুশী হ'লাম। শান্তিরামের স্বভাবই হচ্চে একটু বেশী বকা। কিন্তু তার বকুনি আমার শুনতে ভাল লাগে। সে বকুনির ফাঁকে ফাঁকে এমন সব পাড়াগাঁয়ের ঘটনার টুক্‌রো ঢুকিয়ে দেয়, যা গল্প লেখায় চমৎকার—অতি চমৎকার উপাদান। ওর কাছে শোনা ঘটনা নিয়ে দু-একটা গল্প লিখেচিও এর আগে। মনে ভাবলাম, শান্তিরাম এসেচে, ভালই হয়েচে, একা চার ঘণ্টার রাস্তা যাব, তাতে এই শীত। তা ছাড়া এই শীতে ওর মুখের গল্প জম্‌বেও ভাল।

হঠাৎ শান্তিরাম প্লাটফর্ম্মের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকতে লাগল—অবনী ও অবনী, এই যে, এই গাড়ীতে এস কোথায় যাবে?

গুটি তিন-চার ছেলেমেয়ে এক পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের স্বাস্থ্যবতী ও সুশ্রী একটি পাড়াগাঁয়ের বৌ আগে আগে, পিছনে একটি ফর্সা একহারা চেহারার লোক, সবার পিছনে বাক্স পেটরা মাথায় জন দুই কুলি। লোকটি আমাদের কামরার কাছে এসে দাঁড়িয়ে হেসে বল্‌লে—এই যে দাদা, কলকাতা ফিরচেন আজই। আমি? আমি একবার এদের নিয়ে যাচ্চি পাঁচঘরার ঠাকুরের থানে। মসলন্দপুর ষ্টেশনে নেমে যেতে হবে; বাস্ পাওয়া যায়। দলটি আমাদের গাড়ীর পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে খালি একখানা ইণ্টার ক্লাস কামরায় উঠ্‌ল।

শান্তিরাম চেয়ে চেয়ে দেখে বল্‌লে—তাই অবনী এখানে এল না। ইণ্টার ক্লাসের টিকিট কিনা? আঙুল ফুলে কলাগাছ একেই বলে! ওই অবনীদের খাওয়া জুটত না, আজ দল বেঁধে ইণ্টার ক্লাসে চেপে বেড়াতে যাচ্ছে···ভগবান যখন যাকে দ্যান্, আমাদের বোঁচকা বওয়াই সার।

•••

গাড়ী ছাড়লো। সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারে পাম্পিং এঞ্জিনের শেড, কেবীনঘর, ধূমাকীর্ণ কুলীলাইন, সট সট ক'রে দু-পাশ কেটে বেরিয়ে চলেচে, সামনে সিগন্যালের সবুজ বাতি, তারপর দু-পাশে আখের ক্ষেত, মাঠ বাব্‌লা বন। শান্তিরামের গলার সুর শুনে বুঝলাম সে গল্প বলার মেজাজে আছে, ভাল ক'রে আলোয়ান গায়ে দিয়ে বসলাম, উৎসুক মুখে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

শান্তিরাম বল্‌লে—অবনীকে এর আগে কখনো দেখ নি? নিশ্চয়ই দেখেছ ছেলেবেলায়, ও আমাদের নীচের ক্লাসে পড়তো আর বেশ ভাল ফুটবল খেলতো মনে নেই? ওর বাবা কোর্টে নকলনবিশী করতেন,

সংসারের অভাব-অনটন টানাটানি বেড়েই চলেছিল। সেই অবস্থায় অবনীর বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আন্‌লেন। বল্‌লেন কবে মরে যাব, ছেলের বৌয়ের মুখ দেখে যাই। বাঁচলেনও না বেশীদিন, এক পাল পুষ্যি আর একরাশ দেনা ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সংসার থেকে বিদায়

নিলে

তারপর কি কষ্টটাই গিয়েছে ওদের। অবনী পাস করতে পারলে না, চাকরিও কিছু জুটলো না, হরিণখালির বিলের এক অংশ ওদের ছিল অনেক কাল আগে থেকে—শোলা হ'ত সেখানে, সেই বিলের শোলা ইজারা দিয়ে যে-কটা টাকা পেত, তাই ছিল ভরসা।

ওদের গাঁয়ে চৌধুরী-পাড়ায় নিধিরাম চৌধুরী ব'লে একজন লোক ছিল। গাঁয়ে তাকে সবাই ডাকতো নিস্থু চৌধুরী। নিস্থু চৌধুরীর কোন কুলে কেউ ছিল না, বিয়ে করেছিল দু-দু'বার, ছেলেপুলেও হয়েছিল কিন্তু টেকেনি। ওর বাবা সেকালে নিমকির দারোগা ছিল, বেশ দু-পয়সা জমিয়ে বিষয় সম্পত্তি ক'রে গিয়েছিল। তা শালিয়ানা প্রায় হাজার বারো-শ টাকা আয়ের জমা, আম-কাঁটালের বাগান, বাড়িতে তিনটে গোলা, এক একটা গোলায় দেড়পাট দু-পাট ক'রে ধান ধরে, দুটো পুকুর, তেজারতি কারবার। নিস্থু চৌধুরী ইদানীং তেজারতি কারবার গুটিয়ে ফেলে জেলার লোন আপিসে নগদ টাকাটা রেখে দিত। সেই নিস্থু চৌধুরীর বয়স হ'ল, ক্রমে শরীর অপটু হয়ে পড়তে লাগল, সংসারে মুখে জলটি দেবার একজন লোক নেই। আবার পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার জান তো? পয়সা নিয়ে বাড়িতে কাউকে খেতে দেওয়া—এ রেওয়াজ নেই। তাতে সমাজ নিন্দে হয়, সে কেউ করবে না। নিস্থু চৌধুরী

তখন একবার অসুখে পড়ে দিন-কতক বড় কষ্ট পেলে—এ-সব দিকের পাড়াগাঁয়ের জান তো ভায়া, না পাওয়া যায় রাঁধুনী বামুন, না পাওয়া যায় চাকর, পয়সা দিলেও মেলানো যায় না। দিন দশবারো ভুগবার পর উঠে একটু সুস্থ হয়ে একদিন নিসু চৌধুরী অবনীকে বাড়িতে ডাকালে। বল্‌লে বাবা অবনী, আমার কেউ নেই, এখন তোমরা পাঁচ জন ভরসা। তা তোমার বাবা আমাকে ছোট ভাইয়ের মত দেখতেন, তোমাদের পাড়ায় তখন যাতায়াতও ছিল খুব। তারপর এখন শরীরও হয়ে পড়েচে অপটু, তোমাদের যে গিয়ে খোঁজখবর করবো, তাও আর পারিনে। তা আমি বলচি কি, আমার যা আছে সব লেখাপড়া ক'রে দিচ্চি তোমাদের, নাও—নিয়ে আমাকে তোমাদের সংসারে জায়গা দেও। তুমি আমার দীনু-দার ছেলে, আমার নিজের ছেলেরই মত। তোমাকে আর বেশী কি বল্‌বো বাবা!

অবনী আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। নিসু চৌধুরীর নগদ টাকা কত আছে কেউ অবিশ্যি জানে না, কিন্তু বিষয়-সম্পত্তির আয়, ধান এ সব যা আছে, এ গাঁয়ে এক রায়েদের ছাড়া আর কারু নেই। সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিতে চায় নিসু চৌধুরী তার নামে! অবনীর মুখ দিয়ে তো কথা বেরুলো না খানিকক্ষণ। তারপর বল্‌লে—আচ্ছা কাকা, বাড়িতে একবার পরামর্শ ক'রে এসে কাল বল্‌ব।

নিসু চৌধুরী বল্‌লে—বেশ বাবা, কিন্তু এ-সব কথা এখন যেন গোপন থাকে। পরদিন গিয়ে অবনী জানালে এ প্রস্তাবে তাদের কোন আপত্তি নেই। নিসু চৌধুরী বল্‌লে—বৌমা তাহ'লে রাজি হয়েচেন? দ্যাখো তা হ'লে আমার একটা সাধ আছে, সেটা বলি। আমার এত বড়

বাড়িখানা পড়ে আছে, অনেক দিন এতে মা-লক্ষ্মীদের চরণ পড়েনি, ঠিকমত সন্ধ্যে পড়ে না। তোমাদের ও বাড়িটাও তো ছোট, ঘর-দোরে কুলোয় না, তা ছাড়া পুরোনোও বটে। তোমরা আমার এখানে কেন এস না সবশুদ্ধ? তোমারই তো বাড়ি-ঘর হবে, তোমাকেই সব দিয়ে যখন যাব, তখন এখন থেকে তোমার নিজের বাড়ি তোমরা না দেখলে নষ্ট হয়ে যাবে যে!

এ প্রস্তাবেও অবনী রাজি হ'ল, একটা ভাল দিন দেখে সবাই এ বাড়িতে চলে এল। অবনীর বৌ নিস্থ চৌধুরীর বাড়ি কখনো দেখেনি, কারণ সে ও-পাড়ার বৌ, এ-পাড়ায় আসবার দরকার তেমন হয়নি কখনো। ঘর-বাড়ি দেখে বৌ যেমন অবাক্ হয়ে গেল, তেমনি খুশী হ'ল। নিস্থ চৌধুরীর বাবা রোজগারের প্রথম অবস্থায় সখ ক'রে বাড়ি উঠিয়েছিলেন—তখনকার দিনে সস্তাগণ্ডার বাজার ছিল দেখে অবাক হবার মত বাড়িই করেছিলেন বটে, পাড়াগাঁয়ের পক্ষে অবিশ্যি। কল্‌কাতার কথা ছেড়ে দেও। মস্ত দোতলা বাড়ি, ওপরে নীচে বড় বড় সাত আটখানা ঘর, বারান্দা, প্রকাণ্ড ছাদ, সান-বাঁধানো উঠোন, ভেতর বাড়িতে, পাকা রান্নাঘর, ইঁদারা, বাইরে প্রকাণ্ড বৈঠকখানা। বাড়ির পেছনে ফলের বাগান, ছোট একটা পুকুর, বাঁধানো ঘাট—পাড়াগাঁয়ে সম্পন্ন গেরস্ত বাড়ি যেমন হয়ে থাকে।

ওরা বাড়িতে উঠে এসে জাঁকিয়ে সত্যনারাণের পূজো দিলে, লোকজন খাওয়ালে, লক্ষ্মীপূজো করলে! সবাই বল্‌লে অবনীর বৌয়ের পয় আছে, নইলে অমন বিষয়-সম্পত্তি পাওয়া কি সোজা কথা আজকালকার বাজারে? আবার অনেকেরই চোখ টাটালো।

এ-সব হ'ল গিয়ে ও-বছর ফাগুন মাসের কথা। গত বছর বোশেখ মাসে নিস্থু চৌধুরী মারা গেল। জ্বর হয়েছিল, অবনী ভাল ভাল ডাক্তার দেখালে, খুলনা থেকে নৃপেন ডাক্তারকে নিয়ে এল—বিস্তর পয়সা খরচ করলে, অবনীর বৌ মেয়ের মত সেবা করলে—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। অবনী বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করলে খুব ঘটা ক'রে, সমাজ খাওয়ালে—তা সবাই বল্‌লে দেখে শুনে যে নিজের ছেলে থাকলে নিস্থু চৌধুরীর—সেও এর বেশী আর কিছু করতে পারত না। তারপর এখন ওরাই সম্পত্তির মালিক, অবনী নিজেও খাটিয়ে ছেলে, কোনো নেশা-ভাঙ্ করে না, অতি সৎ। কাজেই বিষয় উড়িয়ে দেবে সে ভয় নেই, দেখে শুনে খাবার ক্ষমতা আছে।

তাই বল্‌ছিলাম, ভগবান যাকে দেন, তাকে এম্‌নি করেই দেন। ওই অবনীর বৌ আঁচল পেতে চাল ধার ক'রে নিয়ে গিয়েচে আমার মাসীমাদের বাড়ি থেকে, তবে হাঁড়ি চড়েচে—এমন দিনও গিয়েচে ওদের। আমার মাসীমার বাড়ি ওদের একই পাড়ায় কিনা? তাঁরই মুখে সব শুন্‌তে পাই। আর তারাই এখন দেখো ইণ্টার ক্লাসে—ভগবান যখন যাকে—

অবনীর বৌটি খুব ভাল, অত্যন্ত গরিব ঘরের মেয়ে ছিল, পড়েছিলও তেম্‌নি গরিবের ঘরে। সে নাকি মাসীমার কাছে বলেচে যা কোনদিনও স্বপ্নেও ভাবিনি দিদি তাই যখন হ'ল, এখন ভাবি, ভগবান সব বাঁচিয়ে বর্ত্তে রাখলে হয়। গরিব লোকের কপাল, ভরসা করতে ভয় পাই দিদি। প্রথম যে-দিন বাড়িতে ঢুক্‌লাম, দেখি এ যেন রাজবাড়ি, অত ঘরদোর অত বড় জানলা দরজা, এতে আবার ছেলে-মেয়েরা বাস কত্তে

পারবে, জান তো কি অবস্থায় ছিলাম, তোমার কাছে আর কি লুকুবো? এ যেন সবই স্বপ্ন ব'লে মনে হয়েছিল। এখন ব্রতটা নেমটা ক'রে, দু-দশ জন ব্রাহ্মণের পাতে দু-মুঠো ভাত দিয়ে যদি ভালয় ভালয় দিনগুলো কাটাতে পারি, তবে তো মুখ থাকে লোকের কাছে। সেই আশীর্ব্বাদ করো তোমরা সকলে।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিধারে খুব গাঢ় হয়েচে। ট্রেন হু হু ক'রে অন্ধকার মাঠ, বাঁশবন, বিল, জলা, আখের ক্ষেত মাঝে মাঝে ঘন অন্ধকারের মধ্যে জোনাকী-জ্বলা ঝোপ পার হ'য়ে উড়ে চলেচে, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, খড়ে-ছাওয়া বিশ-ত্রিশটা চালাঘর এক জায়গায় জড়াজড়ি ক'রে আছে, দু-চার দশটা মিটমিটে আলো জ্বলে অন্ধকারে ঢাকা গাছপালায় ঢাকা গ্রামগুলোকে কেমন একটা রহস্যময় রূপ দিয়েচে।

একটা বড় গ্রামের ষ্টেশনে অবনী তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে নেমে গেল। ষ্টেশনের বাইরে একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে বোধ হয় ওদেরই জন্যে। অবনীর বৌকে এবার প্ল্যাটফর্ম্মের তেলের লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় দেখে আরও বেশী ক'রে মনে হ'ল যে মেয়েটি সত্যিই সুশ্রী। বেশ ফর্সা রং, সুঠাম বাহু দুটির গড়ন, চলনভঙ্গী ও গলার সুরের সবটাই মেয়েলি এমন নিখুঁত মেয়েলি ধরণের মেয়ে দেখবার একটা আনন্দ আছে, কারণ সেটা দুষ্প্রাপ্য। ট্রেনখানা প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল; একজন লোক হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে ওদের এগিয়ে নিতে এসেছিল, ওরা তার সঙ্গে ষ্টেশনের বাহিরে যেতে গিয়ে ফটক খোলা না পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কারণ যিনি ষ্টেশন-মাষ্টার, তিনিই বোধ

হয় টিকিট নেবেন যাত্রীদের কাছ থেকে ফটকে চাবী দিয়ে তিনি গার্ডকে দিয়ে প্ল্যাটফর্ম্মের মধ্যে আঁধারে লণ্ঠনের আলোয় কি কাগজপত্র সই করাচ্ছিলেন।

তারপর ট্রেন আবার চল্‌তে লাগল—আবার সেই রকম ঝোপ-ঝাপ অন্ধকারে ঢাকা ছোট-খাট গ্রাম, বড় বড় বিল, বিলের ধারে বাগ্‌দীদের কুঁড়ে। আমার ভারি ভাল লাগছিল—এই সব অজানা ক্ষুদ্র গ্রামে ঘরে ঘরে অবনীর বৌয়ের মত কত গৃহস্থবধূ ভারবাহী পশুর মত উদয়াস্ত খাটচে হয়ত পেটপুরে দু-বেলা খেতেও পায় না, ফর্সা কাপড় বছরে পরে হয়ত দু-দিন কি তিন দিন, হয়ত সেই পূজোর সময় একবার, কোন সাধ-আহ্লাদ পূরে না মনের, কিছু দেখে না, জানে না, বোঝে না, মনে বড় কিছু আশা করতে শেখেনি, বাইরের দুনিয়ার কিছু খবর রাখে না—পাড়াগাঁয়ের ডোবার ধারের বাঁশবাগানের ছায়ায় জীবন তাদের আরম্ভ, তাদের সকল সুখ-দুঃখ, আনন্দ আশা-নিরাশার পরিসমাপ্তিও ঐখানে।

অবনীর বৌ গৃহস্থ বধূদেরই একজন। অন্ততঃ ওদের একজনও তার সাধের স্বর্গকে হাতে পেয়েচে। অন্ধকারের মধ্যে আমি বসে বসে এই কথাই ভাবছিলাম। আমি কল্পনা করবার চেষ্টা করলাম অবনীর বৌকে, যখন সে প্রথম নিস্তু চৌধুরীর বাড়িতে এল—কি ভাবলে অত বড় বাড়িটা দেখে,···অত ঘরদোর!···যখন প্রথম জানলে যে সংসারের দুঃখ দূর হয়েচে, প্রথমে যখন সে তার ছেলেমেয়েদের ফর্সা কাপড় পরতে দিতে পারলে, আমি কল্পনা করলাম দশঘরার হাট থেকে অবনী বড় মাছ, সন্দেশ, ছানা কিনে বাড়িতে এসেচে···অবনীর বৌ

এই প্রথম সচ্ছলতার মুখ দেখলে তার সে খুশী-ভরা চোখমুখ অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পাচ্চি।···

ট্রেন আর একটা ষ্টেশনে এসে দাঁড়িয়েচে। শান্তিরাম আলোয়ান মুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে, মাঝে মাঝে ঢুল্‌চে। ষ্টেশনে পানের বোঝা উঠচে। শান্তিরামকে বললাম—শান্তিরাম, ঘুমুচ্চ নাকি? আমি একটা গল্প জানি এই রকমই, তোমার গল্পটা শুনে আমার মনে পড়েচে সেটা শুন্‌বে?···

কিন্তু শান্তিরাম এখন গল্প শুন্‌বার মেজাজে নেই। সে আরামে ঠেস্ দিয়ে আরও ভাল ক'রে মুড়িসুড়ি দিয়ে বস্‌লো। সে একটু ঘুমুবে।

পূর্ণবাবুর কথা আমার মনে পড়েচে শান্তিরামের গল্পটা শুন্‌বার পরে এখন। পূর্ণবাবু আমিন ছিল, পাটনায় আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। পূর্ণবাবুর বয়স তখন ছিল পঞ্চান্ন কি বাহান্ন বছর। লম্বা রোগা চেহারা, বেজায় আফিম খেতো—দাঁত প্রায় সব পড়ে গিয়েছিল, মাথার চুল প্রায়ই শাদা,—নাক বেশ টিকল, অমন সুন্দর নাক কিন্তু আমি কম দেখেছি, রং না-ফর্সা না-কালো। পূর্ণবাবু খুব কম মাইনে পেত, এখানে কোন রকমে চালিয়ে বাড়িতে তার কিছু টাকা না পাঠালেই চল্‌বে না—কাজেই তার পরনে ভাল জামা-কাপড় এক দিনও দেখিনি। পূর্ণবাবু নিজে রেঁধে খেত। এক দিন তার খাবার সময় হঠাৎ গিয়ে পড়েচি—দেখি পূর্ণবাবু খাচ্চে শুধু ভাত—কোন তরকারী, কি শাক, কি আলুভাতে কিছু না—কেবল একতাল সবুজ পাতালতা বাটা-ওষুধের মত দেখতে—কি একটা দ্রব্য ভাতের সঙ্গে মেখে মেখে

খাচ্চে। জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লাম, সবুজ রঙের দ্রব্যটা কাঁচা নিমপাতা বাটা। পূর্ণবাবু একটু অপ্রতিভের সুরে বললেন নিমপাতা-বাটা এত উপকারী, বিশেষ ক'রে লিভারের পক্ষে। ভাত দিয়ে মেখে যদি খাওয়া যায়—আমি আজ দু-বছর ধ'রে—আজ্ঞে দেখবেন খেয়ে শরীর বড় ঠাণ্ডা—তা-ছাড়া কি জানেন, লোভ যত বাড়াবেন, ততই বাড়বে—

উপকারী দ্রব্য ত অনেকই আছে, ডাল ঝোলের বদলে কুইনাইন মিক্‌শ্চার ভাতের সঙ্গে মেখে দু-বেলা খাওয়ার অভ্যেস করতে পারলে দেশের ম্যালেরিয়া সমস্যার একটা সুসমাধান হয়, তাও স্বীকার করি। কিন্তু জীবনে বড় বড় উপদেশগুলো চিরকাল লঙ্ঘন ক'রে চলে এসে এসে আজ নীতি ও স্বাস্থ্য-পালন সম্বন্ধে এত বড় একটা সজীব আদর্শ চোখের সাম্‌নে পেয়ে খানিকক্ষণের জন্যে নির্ব্বাক্ হয়ে গেলাম। আর এক দিন দু-দিন নয়, দু-বছর ধরে চলেচে এ ব্যাপার!

এক দিন পূর্ণবাবু নিজের জীবনের অনেক কথা বললেন। কল্‌কাতায় তাঁদের বাড়ি, ভবানীপুরে। তাঁর একজন পিসিমা আছেন, একটু দূর-সম্পর্কের সেই পিসিমার মৃত্যুর পরে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন পূর্ণবাবু। কিন্তু পিসিমা মরি-মরি করচেন আজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর।

পূর্ণবাবুর বিবাহ হয় বাগবাজারে বেশ সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ের সঙ্গে—তবে তখন তাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। পূর্ণবাবুদের পৈতৃক বাড়িও নেই কল্‌কাতায়, ভবানীপুরে খুব আগে নাকি প্রকাণ্ড বাড়ি পুকুর ছিল, এখন তাঁদের দু-পুরুষ ভাড়াটে বাড়িতে থাকে।

পূর্ণবাবুর আঠার উনিশ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়, তিনি ছেলের জন্যে শুধু যে কিছু রেখে যাননি তা নয়, ছেলেটিকে লেখাপড়াও শেখান নি। কারণ তিনিও জানতেন এবং সবাই জান্‌ত যে তার দরকার নেই, অত বড় সম্পত্তির যে মালিক হবে দু-দিন পরে তার কি হবে লেখা-পড়ায় ?

ছেলেটিও জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত তাই জান্‌ত ব'লে লেখাপড়া শেখবার কোন চেষ্টাও ছিল না। পূর্ণবাবুর শ্বশুর তাই ভেবে মেয়েকে ঐ গরীব ঘরে দিয়েছিলেন।'

পূর্ণবাবুর বাবা তো মারা গেলেন, পূর্ণবাবুর ঘাড়ে রেখে গেলেন সংসার, নববিবাহিতা পুত্রবধূ, অল্প কিছু দেনা। কিন্তু পূর্ণবাবুর ক্রেডিট তখন পুরোমাত্রায়—কি বাজারে কি বন্ধুবান্ধব মহলে। টাকা হাত পাত্‌লেই পাওয়া যায়—ধারে দোকানে জিনিষ পাওয়া যায়, নিত্য নূতন বন্ধু জোটে। পূর্ণবাবু খুশী, পূর্ণবাবুর তরুণী বৌ খুশী, আত্মীয়-স্বজন খুশী, বন্ধুবান্ধব খুশী। কারণ, সবাই জানে বুড়ী আর ক'দিন ? না হয় মেরে কেটে আর পাঁচটা বছর !

অবিশ্যি পূর্ণবাবুর তখন বয়স অনেক কম, সংসারের কিছুই বোঝেন না, জানেন না—মনে উৎসাহ, আশা অদম্য আনন্দের উৎস—চোখের সামনে দীপ্ত রঙীন ভবিষ্যৎ—যে ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, আশঙ্কা নেই, যা একদিন হাতের মুঠোয় ধরা দেবেই—এ অবস্থায় যে যা বুঝিয়েচে পূর্ণবাবু তাই-ই বুঝেচেন, টাকাকড়ি ধার ক'রে দু-হাতে উড়িয়েচেন, বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যও করেচেন, ধারে যতদিন এবং যতটা নবাবি করা চলে, বাকী রাখেন নি।

কিন্তু ক্রমে বছর যেতে লাগলো, দু-তিন বছর পরে আজ ধার মেলে না—সকলেই হাত গুটিয়ে ফেললে। পাওনাদারের যাতায়াত সুরু হ'ল—এইজন্যে আরও বিশেষ ক'রে পূর্ণবাবু বাজারে ক্রেডিট হারিয়ে ফেললেন যে সবাই দেখলে পূর্ণবাবুর পিসিমা ওঁদের আদৌ বাড়িতে ডাকেন না, পূর্ণবাবুকেও না, পূর্ণবাবুর বৌ, ছেলেমেয়ে কাউকে না।

পিসীমার কাছে খাতির পেলে বাজারেও পূর্ণবাবুর খাতির থাক্‌তো—অনেকে বল্‌তে লাগলো পূর্ণবাবুর পিসীমা ওদের দেখতে পারে না, সমস্ত সম্পত্তি হয়ত দেবোত্তর ক'রে দিয়ে যাবে—একটি পয়সাও দেবে না ওদের।

পূর্ণবাবুর পিসিমার বিশ্বাস যে এরা তাঁকে বিষ খাইয়ে মারবে—যত বয়স হচ্চে, এ বিশ্বাস আরও দিন দিন বাড়চে—এতে ক'রে হয়েচে এই যে পূর্ণবাবুর, কি পূর্ণবাবুর স্ত্রীর, কি পূর্ণবাবুর ছেলেমেয়ের পিসিমার বাড়ির ত্রি-সীমানায় ঘেঁস্‌বার যো নেই। কাজেই অত বড় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েও পূর্ণবাবু আজ ত্রিশ টাকা মাইনের আমানগিরি করচেন।

আমি পূর্ণবাবুর এ গল্প বিশ্বাস করিনি। কিন্তু সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে আমরা একসঙ্গে দেড় বছরের উপর ছিলাম—এই দেড় বৎসরের প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় কি রাত্রে এক সঙ্গে বস্‌বার সুযোগ হ'লেই পূর্ণবাবু আমায় তাঁর পিসিমার সম্পত্তির গল্প করতেন। কখন কোন্‌টা হয়ত ব'লে ফেলেচেন ছ-মাস আগে তাঁর মনে থাক্‌বার কথা নয়, আবার আজ যখন নতুন কথা বল্‌চেন ভেবে বল্‌লেন তখন খুঁটিনাটি ঘটনাগুলোও

ছ-মাস আগের কাহিনীর সঙ্গে মিলে যেত—নানা টুকরো কথার জোড়াতালি মিলিয়ে এই দেড় বছরে পূর্ণবাবুর সমস্ত গল্পটা আমি জেনেছিলুম—এক দিন তিনি ব'সে আগাগোড়া গল্প আমায় করেন নি, সে ধরণের গল্প করার ক্ষমতাও ছিল না পূর্ণবাবুর।

সেই থেকে পূর্ণবাবুর দুর্দ্দশার সূত্রপাত হ'ল। বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে গেল, শ্বশুরবাড়িতে খাতির কমে গেল, সংসারে দারিদ্রের ছায়া পড়ল। দু-এক জন হিতৈষী বন্ধুর পরামর্শে পূর্ণবাবু আমীনের কাজ শিখতে গেলেন—ছেলেকে বাপের ধাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

এ-সব আজ ত্রিশ বছর আগেকার কথা।

এই ত্রিশ বছরে পূর্ণবাবুর আমোদপ্রিয়, সৌখীনচিত্ত, অপরিণামদর্শী যুবক থেকে কন্যাদায়গ্রস্ত, রোগজীর্ণ, অকাল-বৃদ্ধ, দারিদ্র্যভারে কুব্জদেহ ত্রিশ টাকা মাইনের আমীনে পরিণত হয়েচেন—এখন আর মনে তেজ নেই, শরীরে বল নেই, খেলে হজম করতে পারেন না, চুল অধিকাংশই পেকে গিয়েচে, কসের অনেকগুলো দাঁত পড়ে গেলেও পয়সা অভাবে বাঁধাতে পারেন না ব'লে গালে টোল খেয়ে যাওয়ায় বয়সের চেয়েও বুড়ো দেখায়।

বাড়ির অবস্থাও ততোধিক খারাপ। পনেরো টাকা ভাড়ার এঁদো ঘরে বাস করার দরুণ স্ত্রী ছেলে মেয়ে সকলেই নানারকম অসুখে ভোগে—অথচ উপযুক্ত চিকিৎসা হয় না। তিনটি মেয়ের বিয়েতে পূর্ণবাবু একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গিয়েচেন, অথচ মেয়ে তিনটির প্রথম দুটি ঘোর অপাত্রে পড়েচে। বড় জামাই বৌবাজারে দরজীর দোকান করে, ঘোর মাতাল, কুচরিত্র—বাড়িতে স্ত্রীকে মারপিট করে প্রায়ই, তবুও

সেখানে মেয়েকে মুখগুঁজে প'ড়ে থাক্‌তে হয়—বাপের বাড়ি এলে শোবার জায়গাই দেওয়া যায় না। মেজ জামাই মাতাল নয় বটে, কিন্তু তার এক পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নেই—রেলে সামান্য কি চাকুরী করে, সে সংসারে সবাই একবেলা খেয়ে থাকে, তাই নাকি অনেক দিন থেকে নিয়ম। আর একবেলা সকলে মুড়ি খায়। মেজ মেয়ের দুঃখ পূর্ণবাবু দেখতে পারেন না ব'লে মাঝে মাঝে তাকে বাড়িতে আনিয়ে রাখেন; সেখানে এলে তবু মেয়েটা খেতে পায় পেট পূরে দু-বেলা। আজকাল প্রায়ই জ্বরে ভোগে, শরীর ও খারাপ হয়ে গিয়েচে, ডাক্তারে আশঙ্কা করেচে থাইসিস্‌। বুড়ী পিসীমা কিন্তু এখনও বেঁচে। এখনও বুড়ী গঙ্গাস্নানে যায়। নিজের হাতে রেঁধে খায়, বয়স নব্বুই-এর কাছাকাছি, কিন্তু এখনও চোখের তেজ বেশ, দাঁত পড়েনি, বুড়ী একেবারে অশ্বত্থামার পরমায়ু নিয়ে জন্মেছে, এদিকে যারা তার মরণের পানে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, তাদের জীবন ভাঁটিয়ে শেষ হ'তে চলল।

সেট্‌লমেণ্টের কাজ ছেড়ে পাটনা থেকে চলে এলাম। পূর্ণবাবু তখনও সেখানে আমীন। বছর তিনেক পরে একদিন গয়া ষ্টেশনে পূর্ণবাবুর সঙ্গে দেখা। দুপুরের পর এক্সপ্রেস আসবার সময় ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে পায়চারী করচি, একটু পরেই ট্রেনটা এসে দাঁড়ালো। পূর্ণবাবু নাম্‌লেন একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা থেকে, অন্য কামরা থেকে দু-জন দরোয়ান নেমে এসে জিনিষপত্রের তদারকে ব্যস্ত হয়ে পড়্‌ল। আমি অবাক্‌ হ'য়ে চেয়ে রইলাম। পূর্ণবাবুর পরণে দামী কাঁচি ধুতি গায়ে সাদা শিল্কের পাঞ্জাবী, তার ওপরে জমকালো পাড় ও কল্কাদার শাল, পায়ে

প্যারিস গার্টার আঁটা সিল্কের মোজা ও পাম্পশু চোখে সোনার চশমা, হাতে সোনার ব্যাণ্ড্ওয়ালা হাতঘড়ি।

আমি গিয়ে আলাপ করলাম। পূর্ণবাবু আমায় চিনতে পেরে বললেন ...এই যে রামরতনবাবু, ভাল আছেন? তারপর এখন কোথায়?

আমি বল্লাম—আমি এখানে চেঞ্জে এসেচি মাস-তিনেক, আপনি এদিকে—ইয়ে—

তাঁর অদ্ভুত বেশভূষার দিকে চেয়ে আমি কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। পূর্ণবাবুকে এ বেশে দেখ্তে আমি অভ্যস্ত নই, আমার কাছে সুতীর ময়লা-চিট্ সোয়েটার ও সবুজ আলোয়ান গায়ে পূর্ণবাবু বেশী বাস্তব,—তা-ছাড়া চুয়ান্ন পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধের একি বেশ!

কি ব্যাপারটা ঘটেচে তা অবশ্য পূর্ণবাবু বলবার আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে পূর্ণবাবু ওয়েটিং রুমে ঢুকলেন; তিনি সাউথ বিহার লাইনের গাড়ীতে যাবেন। গাড়ীর এখনও ঘণ্টা-দুই দেরি। একজন দারোয়ানকে ডেকে বল্লেন—ভূপাল সিং, এখানে ভাল সিগারেট পাওয়া যায় কিনা দেখে এস—নইলে কাঁচি নিয়ে এস এক বাক্স—

আমায় বললেন—ওঃ অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা। আর বলেন কেন, বিষয় থাকলেই হাঙ্গামা আছে। সাম্নে আস্চে জানুয়ারী কিস্তী—তহশীলদার বেটা এখনও এক পয়সা পাঠায় নি, লিখেচে এবার নাকি কলাই ফসল সুবিধে হয়নি। তাই নিজে যাচ্চি মহালে, মাসখানেক থাক্বো। গাড়ীটা এখানে আসে কটায়? ভাল কথা এখানে টাইম্-টেবেল কিন্তে পাওয়া যাবে? কিন্তে ভুল হয়ে গেল হাওড়ায়—

আমি জিগ্যেস করলাম—আপনার পিসীমা

দারোয়ান সিগারেট নিয়ে এল। পূর্ণবাবু একটা সরু ও সুদীর্ঘ হোল্ডার বার করলেন, আমার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—আসুন।

তারপর সিগারেট ধরিয়ে আরামে ধোঁয়া ছেড়ে বল্‌লেন—পিসীমা মারা গিয়েচেন আর-বছর কার্ত্তিক মাসে। তারপর থেকেই বিষয়-আশয়ের ঝঞ্ঝাটে পড়েচি—নিজে না দেখলে কি জমিদারী টেকে? আর এই বয়সে ছুটোছুটি ক'রে পারিনে, একটা ভাল কাজ-জানা লোকের সন্ধান দিতে পারেন রামরতনবাবু? টাকা চল্লিশ মাইনে দেব, খাবে থাকবে—

ওয়েটিং রুমে ব'সে পূর্ণবাবু দু-বোতল লেমনেড খেলেন এই শীতকালে। একবার দারোয়ানকে দিয়ে গরম জিলিপী আনালেন দোকান থেকে, একবার নিম্‌কী বিস্কুট আনালেন। আর একবার নিজে ষ্টেশনের বাইরের দোকান থেকে এক ডজন কমলালেবু কিনে আনলেন। আমায় প্রতিবারেই খাওয়ানোর জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন, কিন্তু আমার শরীর খারাপ, খেতে একেবারেই পারিনে, সে কথা জানিয়ে ক্ষমা চাইলাম। একটুপরেই পূর্ণবাবুর ট্রেন এসে পড়ল। দিন পনের কুড়ি পরে আবার বেড়াতে গিয়েচি ষ্টেশনে। সেদিন শীত খুব পড়েচে, বেশ জ্যোৎস্না রাত আটটার কম নয়। ষ্টেশনের রাস্তা যেখানে ঠেকেছে সেখানে চপকাটলেট-চায়ের দোকান থেকে কে আমার নাম ধ'রে ডাকলে—ও রামরতনবাবু—এই যে—এদিকে—ফিরে চেয়ে দেখি পূর্ণবাবু একটা কোণে টেবিলে ব'সে। পূর্ণবাবুর মাথায় একটা পশমের কান-

ঢাকা টুপি, শালের কম্পর্টার গলায় জড়ানো, হাতে দস্তানা। আমায় বল্‌লেন—আসুন, বসুন কিছু খাওয়া যাক। আজ ফিরে এলাম মহাল থেকে—এই রাতের গাড়ীতে ফিরব কলকাতায়—কিছু খাবেন না?... না, না, খেতেই হবে কিন্তু, সেদিন তো কিছু খেলেন না—এই বয়, ইধার আও—

আমাকে জোর করে পূর্ণবাবু চেয়ারে বসালেন। তারপর তাঁর নিজের জন্যে যা খাবার দিলে, তা দেখে আমার ত হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ল। এত খাবেন কি করে পূর্ণবাবু এই বয়সে আর একটা অতি বাজে দোকানে, খান আষ্টেক চপ্, খানচারেক কাটলেট, এক প্লেট মাংস, পাঁউরুটি, ডিমের মাম্‌লেট, পুডিং, কেক চা—তিনি কিছু বাদ দিলেন না। আমাকে দেখিয়ে বল্‌লেন—এই, বাবুকো ওয়াস্তে এক প্লেট মাটন্ আউর তিন্ পিস্—

আমি সবিনয়ে বল্‌লাম—আমার শরীর তো জানেন পূর্ণবাবু, ওসব কিছু আমি—

—আরে, তা হোক্, শরীর শরীর করলে কি চলে! খান্ খান্—মাংসটা বেশ করেচে—কল্‌কাতায় মাংস রাঁধতে জানে না মশাই রেষ্টোরেণ্ট—আমি ঝাল পছন্দ করি, কল্‌কাতায় শুধু মিষ্টি—খেয়ে দেখুন মাংসটা—কাট্‌লেটেও এরা কাঁচালঙ্কা-বাঁটা দিয়েচে—ভারি চমৎকার খেতে—এই বয়, আউর দুটো কাটলেট—

কথাটা শেষ হবার আগেই তাঁর বেজায় কাশির বেগ হ'ল—কাশতে কাশতে দম আটকে যায় আর কি!

একটু সাম্‌লে বললেন—বড্ড ঠাণ্ডা লেগেচে মহালে—সেই জন্যে

বেশ একটু গরম চা—চপ খেয়ে দেখবেন ? ভারি চমৎকার চপ করেচে ! এই বয়,—

আমি কথাটা মুখ ফুটে বল্‌লাম—পূর্ণবাবু, আপনার শরীরে এসব খাওয়া উচিত নয়—আর এ ধরণের দোকান তো, খুব ভাল নয় ? চা বরং এক কাপ খান, কিন্তু এত—এগুলো খেলে—

পূর্ণবাবু হেসে উড়িয়ে দিলেন—খাবো না বলেন কি রামরতনবাবু, খাবার জন্যেই সব। শরীরকে ভয় করলেই ভয়, ওসব ভাবলে কি আর—আপনিও যেমন।

রেষ্টোরেণ্ট থেকে বার হয়ে এসে আমায় নীচু স্বরে বল্‌লেন—কিছু মনে করবেন না রামরতনবাবু, একসঙ্গে অনেক দিন কাজ করেচি এক জায়গায়। এখানে কোন ভাল বাইজীর বাড়িটাড়ি জানা আছে ? থাকে তো চলুন না আজ রাতটা—শুনিচি পশ্চিমে নাকি ভাল ভাল -- কলকাতায় না হয় আজ নাই গেলাম—

আমি বুঝিয়ে বললাম, পশ্চিমের যে সব জায়গায় ভাল বাইজী থাকে, গয়া সে তালিকায় পড়ে না। বিহারের কোথাও নয়। কাশী, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী ওদিকেই সত্যিকার বাইজী বল্‌তে যা বোঝায়, তা আছে।

পূর্ণবাবু বল্‌লেন—পাটনাতে নেই ?

—আমার তাই মনে হয়।

এদিকে আর কোথাও নেই ? না হয় এম্‌নি আর কোথাও—

কোথাও কিছু নেই। আমি ঠিক জানি।

পূর্ণবাবু ওয়েটিং-রুমে ঢুকে আমায় বস্‌তে বললেন। পূর্ণবাবুকে

আরও বেশী বৃদ্ধ দেখাচ্ছিল। আমি তাঁর বাড়িতে কে কেমন আছে জিজ্ঞেস করলাম। থাইসিসের রোগী সেই মেয়েটিকে বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা করাচ্চেন, বড় ছেলেটি বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েচে আজ বছর দুই,—সম্পত্তি পাবার আগেই কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তার খোঁজ করেচেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এসব গল্প শুন্‌লাম ব'সে বসে। পূর্ণবাবু গল্পের মধ্যে আরও দু-বার চা আনিয়ে খেলেন, ব্যাগ খুলে ওষুধ খেলেন তিন-চার রকম, কোনটা কবিরাজী, কোনটা বিলিতি পেটেণ্ট ওষুধ। দু-প্যাকেট সিগারেট শেষ করলেন।

দেখলাম পূর্ণবাবু চিরবঞ্চিত জীবনের সর্ব্বগ্রাসী তৃষ্ণায় ভোগলালসা মেটাতে উদ্যত হয়েচেন বিকারের রোগীর মত। চারি ধারে ঘনায়মান মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে, স্বল্পতৈল জীবনদীপের আলো যত সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর জ্যোতিঃবৃত্তের সৃষ্টি করচে উনি ততই উন্মাদ আগ্রহে যেখানে যা পাবার আছে পেতে চান—যা নেবার আছে নিতে চান। জীবনে ওঁর যখন সুবৃষ্টি এল, জল না পেয়ে তখন আধ-মরা, সেই এল—কিন্তু এত দেরি করে ফেললে!

* * *

আমায় বল্‌লে—একটু কিছু বাড়াবাড়ি খেলেই, ওষুধ খেয়ে রাখি। আর হজম করতে পারিনে এখন। আমাদের পাড়ায় আছে গদাধর কবরেজ—খুব ভাল চিকিচ্ছে করে. একহপ্তার ওষুধ নেয় দু-টাকা—তারই কাছে ভাবছি এবার—পূর্ণবাবুর সেই নিমপাতা-বাটা মেখে ভাত খাওয়ার

কথা আমার মনে পড়ল আরও মনে পড়ল পূর্ণবাবুর প্রথম জীবনের সৌখীনতার কথা। এখন তিনি বুঝেছেন আর বেশী দিন বাঁচবেন না, চিরবাঞ্চিত জীবনের সর্ব্বগ্রাসী তৃষ্ণায় ভোগলালসা তাঁর বিকারের রোগীর মত অসংযত, অবুঝ।

শান্তিরামকে গল্পটা বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে।

কনে দেখা

সকাল বেলা বৈঠকখানার গাছপালার হাটে ঘুরছিলাম।

গতমাসে হাটে কতকগুলি গোলাপের কলম কিনেছিলাম, তার মধ্যে বেশীর ভাগ পোকা লেগে নষ্ট হয়ে গেছে। নার্সারির লোক আমার জানাশুনো, তাদের বোল্লাম,—কি রকম কলম দিয়েছিলে হে! সে যে টবে বসাতে দেরী সইল না! তা ছাড়া আবদুল কাদের বলে বিক্রী করলে, এখন সবাই বলচে আবদুল কাদের নয়, ও অত্যন্ত মামুলি জাতের টী রোজ্। ব্যাপার কি তোমাদের?

নার্সারির পুরোনো লোকটাই আজ আছে। সেদিন এ ছিল না, তাই ঠকেছিলাম। এই লোকটা খুব অপ্রতিভ হলো। বল্লে-- বাবু, এই হয়েছে কি জানেন? বাগানের মালিকেরা আজকাল আছেন কল্‌কাতায়। আমি একা সবদিক দেখ্‌তে পারিনে, ঠিকে উড়ে মালী নিয়ে হয়েচে কাজ। তাদের বিশ্বাস কল্লে চলে না, আবার না কল্লেও চলে না। আমি তো সবদিন হাট সাম্‌লাতে পারিনে বাবু! ওদেরই ধরে পাঠাতে হয়, আমি শুনেছিলাম টী রোজ তিনডজন, আমি তো তার কাছ থেকে টী রোজেরই দাম নোবো? এখানে এসে যদি আবদুল কাদের বলে বিক্রী করে, তো তারই লাভ। বাড়্‌তি পয়সা আমার নয়, তার। বুঝ্‌লেন না বাবু?

বাজার খুব জেঁকেছে। বর্ষার নওয়ালির মুখ, নানা ধরণের গাছের আমদানী হয়েচে। বড় বড় বিলিতি দোপাটি, মতিয়া বেল, অতশীলতা, রাস্তার ধারের সারিতে নানা ধরণের পাম্, ছোট ছোট পাম্ থেকে ফ্যান্ পাম্ ও বড় টবে ভাল এরিকা পামও আছে। সূর্য্যমুখীর যদিও এ সময়

নয়, কিন্তু সূর্য্যমুখী এসেছে অনেক। তা ছাড়া কল্‌কাতার রাস্তায় অনভিজ্ঞ লোকদের কাছে অর্কিড্ বলে যা বিক্রী হয়, সেই নারকোলের ছোব্‌ড়া ও তার বাঁধা ফার্ন ও রঙীন আগাছা যথেষ্ট বিক্রী হচ্চে। লোকের ভিড়ও বেশ।

হঠাৎ দেখি আমার অনেকদিন আগেকার পুরোনো রুমমেট্ হিমাংশু। ৭।৩ নং কানাই সরকারের লেনে মেসে তার সঙ্গে অনেকদিন একঘরে কাটিয়েছি। সে আজ সাত আট বছর আগেকার কথা—তারপর সে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। আর তার কোনো খবর রাখিনি আজকাল।

—এই যে হিমাংশু ? চিন্‌তে পারো ?

হিমাংশু চম্‌কে পেছন ফিরে চাইলে এবং কয়েক সেকেণ্ড সবিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌বার পরে সে আমায় চিন্‌লে। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল হাসিমুখে।

—আরে জগদীশবাবু যে! তারপর! ওঃ আপনার সঙ্গে একযুগ পরে—ওঃ! তারপর আছেন কেমন বলুন!

আমি বল্লাম—তোমার গাছপালার সখ দেখ্‌চি আছে হিমাংশু, সেই মনে আছে দুজনে কতদিন এখানে হাটে আস্‌তাম ?

হিমাংশু হেসে বল্লে—তা আর মনে নেই? সেই আপনি দার্জ্জিলিংয়ের লিলি কিন্‌লেন? আপনার তো খুব সখ ছিল লিলির। এখনও আছে? আসুন, আসুন, অন্য কোথাও গিয়ে একটু বসি। ও মেসটার কোনো খবর আর রাখেন নাকি? আচ্ছা সেই অনাদিবাবু কোথায় গেল খোঁজ রাখেন? আর সেই যে মেয়েটী ষ্টোভ জ্বালাতে গিয়ে গা হাত পা পুড়িয়ে ফেল্লে মনে আছে? তার বিয়ে হয়েচে?

দুজনে গিয়ে একটা চায়ের দোকানে বসলাম। এ গল্প ও গল্প—নানা পুরোনো দিনের কথা। তার কথাবার্ত্তার ভাবে বুঝলাম সে কলকাতায় এসেচে অনেক দিন পরে।

জিজ্ঞেস কল্লাম—আজকাল কোথায় থাকো হিমাংশু?

সে বল্লে—বি, এন আর' এর একটী ষ্টেশনে বুকিং ক্লার্ক ছিলাম। টাটা নগরের ও দিকে কিছুদিন থাকবার পর দেখলাম জায়গাটার মাটীতে ভারী চমৎকার ফুল জন্মায়, জমিও সস্তা। সেখানে এখন আছি—ফুলের বাগান করেচি—তুমি তো জানো বাগানের সখ আমার চিরকাল। কিছু চাষ বাসের জমি নিয়েচি তাতেই চলে যায়। কিন্তু সে সব কথা থাক—আজ এখন একটা গল্প করি শোনো। গল্পের মত শোনাবে, কিন্তু আসলে সত্যি ঘটনা। আর আশ্চর্য্য এই, দশবছর আগে যখন তোমাদের মেসে থাকতাম তখন এ গল্পের সুরু, এবং এর সমাপ্তি ঘটেচে গতকাল। আমি বোল্লাম—ব্যাপার কি, তোমার কথা শুনে মনে হচ্চে নিশ্চয়ই প্রেমের কাহিনী জড়ানো আছে এর সঙ্গে। বলো বলো—সে বোল্লে—না, সে সব নয়। অন্য এক ব্যাপার, কিন্তু আমার পক্ষে কোনও প্রণয়কাহিনীর চেয়ে তা কম মধুর নয়। শোনো বলি। আচ্ছা তোমার মনে আছে—মেসে থাকতে আমি একটা এরিকা পাম্ কিনেছিলাম, আমাদের ঘরের সাম্‌নে টবে বসানো ছিল মনে আছে? আচ্ছা তা হোলে শোনো।

তারপর আধঘণ্টা বসে হিমাংশু তার গল্পটা বলে গেল। আমরা আরও দুবার চা খেলাম, একবাক্স সিগারেট্ পোড়োলাম। বৌবাজারের মোড়ে গির্জ্জার ঘড়িটায় সাড়ে নটা যখন বাজ্‌ল, তখন হিমাংশু গল্প শেষ করে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

তার গল্পটা আমি আমার নিজের কথায় বোল্‌বো, কেননা হিমাংশু সম্বন্ধে কিছু জানা থাকা দরকার, গল্পটা ঠিক বুঝ্‌তে হোলে, সেটা আমাকে গোড়াতেই বলে দিতে হবে।

হিমাংশু যখন আমার সঙ্গে থাকতো, তখন তার চালচলন দেখলে মনে হবার কথা যে, সে বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। সে যে আহার বিহারে বা বেশ ভূষায় খুব বেশী সৌখীন ছিল তা নয়, তার সখ ছিল নানা ধরণের এবং এই সখের পেছনে সে পয়সা ব্যয় করতো নিতান্তই বে-আন্দাজী।

তার প্রধান সখ ছিল গাছপালার ও ফুলের। আমার ফুলের সখটা হিমাংশুর কাছ থেকেই পাওয়া একথা বলতে আমার কোনো লজ্জা নেই। কারণ যত তুচ্ছ, যত অকিঞ্চিৎকর জিনিস হয়েই হোক না কেন, যেখানে সত্যি কোনো আগ্রহ বা ভালবাসার সন্ধান পাওয়া যায়—তাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না।

হিমাংশুর গাছপালার ওপর ভালবাসা ছিল সত্যিকার জিনিস। সে ভালো খেতো না, ভাল কাপড় জামা কখনো দেখিনি তার গায়ে—কিন্তু এ ধরণের সুখ সাচ্ছন্দ্য তার কাম্য ও ছিল না। তার পয়সার সচ্ছলতা ছিল না কখনো, টুইশানি করে দিন চালাতো, তাও আবার সব সময় জুটতো না, তখন বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধার করতো। যখন ধারও মিলতো না তখন দিনকতক চন্দননগরে এক মাসীর বাড়ি গিয়ে মাস খানেক, মাস দুই কাটিয়ে আসতো। কিন্তু পয়সা হাতে হোলে কাপড় জামা না, কিনুক, খাওয়া দাওয়ায় ব্যয় করুক না করুক. ভালো গাছপালা দেখ্‌লে কিনবেই।

মেসে আমাদের ঘরের সাম্‌নে ছোট একটা অপরিসর বারান্দাতে সে

তার গাছপালার টবগুলো রাখতো। গোলাপের ওপর তার তত ঝোঁক ছিল না, সে ভাল বাস্‌তো নানা জাতীয় পাম্‌—বিশেষ করে বড় জাতীয় পাম্‌—আর ভাল বাস্‌তো দেশী বিদেশী লতা—উইষ্টারিয়া, অতসী, মাধবীলতা, বোগেন্‌ভিলিয়া ইত্যাদি। কত পয়সাই যে এদের পেছনে খরচ করেছে।

সকালে উঠে ওর কাজই ছিল গাছের পাট কর্ত্তে বসা। শুক্‌নো ডালপালা ভেঙ্গে দিচ্ছে, গাছ ছেঁটে দিচ্ছে, এ টবের্‌ মাটি ও টবে ঢাল্‌চে। পুরোনো টব ফেলে দিয়ে নতুন টবে গাছ বসাচ্চে, মাটী বদ্‌লাচ্চে। আবার মাঝে মাঝে মাটীর সঙ্গে নানা রকমের সার মিশিয়ে পরীক্ষা কর্ত্ত। এ সব সম্বন্ধে ইংরিজি, বাংলা নানা বই কিন্‌তো—একবার কি একটা উপায়ে ও একই লতায় নীলকলমী ও শাদা কলমী ফোটালে। ভায়োলেটের ছিট্‌ ছিট্‌ দেওয়া অতসী অনেক কষ্টে তৈরী করেছিল। বেগুণী রংএর ক্রাইসেন্‌থিমামের জন্যে অনেক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছিল, সুবিধে হয় নি।

তাছাড়া ও ধরণের মানুষ আমি খুব বেশী দেখিনি, যে একটা খেয়াল বা সখের পেছনে সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে দিতে পারে। মানুষের মনের শক্তির সে একটা বড় পরিচয়। হিমাংশু বল্‌তো—সেদিন একটা পাড়াগাঁয়ে একজনদের বাড়ি গিয়েচি, বুঝ্‌লেন? তাদের গোলার কাছে তিন বছরের পুরোনো নারকেল গাছ হয়ে আছে। সে যে কি সুন্দর দেখাচ্চে! একটা প্রকাণ্ড তাজা, সতেজ, সবুজ পাম্‌। সমুদ্রের ধারে নাকি নারকেলের বন আছে—পাম্‌এর সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে হোলে সেখানে যেতে হয়।

যাত্রাবদল

হিমাংশু প্রায়ই পাম্ আর অর্কিড্ দেখ্তে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেতো। আর এসে তাদের উচ্ছসিত বর্ণনা করতো।

একবার সে একটা এরিকা পাম্ কিনে আন্লে। খুব ছোট নয়, মাঝারী গোছের মাটীর টবে বসানো—কিন্তু এমন সুন্দর, এমন সতেজ গাছ বাজারে সাধারণতঃ দেখা যায় না। সে সন্ধান করে করে দম্‌দমায় কোন বাগানের মালীকে ঘুস্ দিয়ে সেখান থেকে কেনে। কল্‌কাতার মেসের বারান্দায় গাছ বাঁচিয়ে রাখা যে কত শক্ত কাজ, যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সহজেই বুঝ্তে পার্‌বেন। গোবি মরুভূমিতে গাছ বাঁচিয়ে রাখা এরচেয়ে সহজ। একবার সে আর আমি দিন কুড়ি বাইশের জন্যে কল্‌কাতার বাইরে যাই, চাকরকে আগাম পয়সা পর্য্যন্ত হিমাংশু দিয়ে গেল গাছে জল দেওয়ার জন্যে, ফিরে এসে দেখা গেল ছ'সাতটা ফ্যান পাম্ শুকিয়ে পাখা হয়ে গেছে।

সকালে বিকালে হিমাংশু বাল্‌তি বাল্‌তি জল টান্তো একতালা থেকে তেতলায় টবে দেবার জন্যে। গাছ বাড়চে না কেন এর কারণ অনুসন্ধান কর্ত্তে তার উদ্বেগের অন্ত ছিল না। অন্য সব গাছের চেয়ে কিন্তু ওই এরিকা পাম্ গাছটার ওপর তার মায়া ছিল বেশী, তার খাতা ছিল—তাতে লেখা থাক্‌তো কোন্ কোন্ মাসে কত তারিখে গাছটা নতুন ডাল ছাড়্লে। গাছটাও হয়ে পড়্‌ল প্রকাণ্ড, মাটির টব বদলে তাকে পিপে-কাটা কাঠের টবে বসাতে হোল। মেসের বারান্দা থেকে নামিয়ে এক তালায় উঠোনে বসাতে হোল। এ সবে লাগলো বছর পাঁচ ছয়।

সেবার বাড়ীওয়ালার সঙ্গে বনিবনাও না হোতে আমাদের মেস্ ভেঙে গেল

দুজনে আর একত্র থাকবার সুবিধে হোল না, আমি চলে গেলাম ভবানীপুরে। হিমাংশু গিয়ে উঠ্‌ল শ্যামবাজার আর একটা মেসে। একদিন আমায় এসে বিমর্ষ মুখে বল্লে—কি করি জগদীশবাবু, ও মেসে আমার টবগুলো রাখ্‌বার জায়গা হচ্ছে না—অন্য অন্য টবের না হয় কিনারা কর্ত্তে পারি, কিন্তু সেই এরিকা পাম্‌টা সেখানে রাখা একেবারে অসম্ভব। একটা পরামর্শ দিতে পারেন? অনেকগুলো মেস্‌ দেখ্‌লাম, অত বড় গাছ্‌ রাখার সুবিধে কোথাও হয় না। আর টানাটানির খরচাও বড় বেশী।

আমি তাকে কোনো পরামর্শ দিতে পারিনি বা তারপর থেকে আমার সঙ্গে সেই থেকে আজকার দিনটি ছাড়া আর কোনোদিন দেখাও হয় নি।

বাকীটা হিমাংশুর মুখে আজই শুনেচি।

কোনো উপায় না দেখে হিমাংশু শেষে কোন্‌ বন্ধুর পরামর্শে ধর্ম্মতলার এক নীলামওয়ালার কাছে এরিকা পামের টবটা রেখে দেয়। রোজ একবার করে গিয়ে দেখে আস্‌তো, খদ্দের পাওয়া গেল কিনা। শুধু যে খদ্দেরের সন্ধানে যেতো তা নয়, ওটা তার একটা ওজুহাত মাত্র—আসলে যেত গাছটা দেখ্‌তে।

হিমাংশু কিন্তু নিজের কাছে সেটা স্বীকার কর্ত্তে চাইত না। দু'দিন পরে যা পরের হয়ে যাবে তার জন্যে মায়া কিসের?

তবুও একদিন যখন গিয়ে দেখ্‌লে, গাছটার সে নধর, সতেজ শ্রী যেন ম্লান হয়ে এসেচে, নীলামওয়ালারা গাছে জল দেয় নি, তেমন যত্ন করে নি—সে লজ্জিত মুখে দোকানের মালিক একজন ফিরিঙ্গি ছোক্‌রাকে

বল্লে—গাছটার তেমন তেজ নেই—এই, গরমে জল না পেলে, দেখ্‌তে ভাল না দেখালে বিক্রী হবে কেন? জল কোথায় আছে আমি নিজে না হয়—কারণ দু'পয়সা আসে, আমারই তো আসবে—

তারপর থেকে যেন পয়সার জন্যেই করচে, এই অছিলায় রোজ বিকেলে নীলামওয়ালার দোকানে গিয়ে গাছে জল দিত। একএকদিন দেখ্‌তো দোকানের চাকরেরা আগে থেকেই জল দিয়েচে।

রোজ নীলামের ডাকের সময় সে সেখানে উপস্থিত থাকতো। তার গাছটার দিকে চেয়েও দেখে না—লোকে চেয়ার, টেবিল, সোফা, আলমারী কিন্‌চে, ভাঙ্গা পুরোণো ক্লক্ ঘড়ী পর্য্যন্ত বিক্রী হয়ে গেল, কিন্তু গাছের সখ খুব বেশী লোকের নেই, গাছটা আর বিক্রী হয় না। একদিন নীলামওয়ালা বল্লে—বাবু, গাছটার তো সুবিধে হচ্ছে না, তুমি নিয়ে যাবে ফেরৎ?

কিন্তু ফেরৎ নিয়ে গিয়ে তার রাখ্‌বার জায়গা নেই, থাক্‌লে এখানে সে বিক্রীর জন্যে দিয়েই বা যাবে কেন? সে সময় তার অত্যন্ত খারাপ সময় যাচ্চে, চাকুরীর চেষ্টায় আকাশ পাতাল হাতড়েও কোথাও কিছু মিল্‌চে না—নিজের থাকবার জায়গা নেই তো পিপে কাটা কাঠের টবে বসানো অত বড় গাছ রাখে কোথায়?

মাস খানেক পরে হিমাংশুর অবস্থা এমন হোল যে আর কল্‌কাতায় থাকাই চলে না। কল্‌কাতার বাইরে যাবার আগে গাছটার একটা কিনারা হ'য়ে গেলে ও মনে শান্তি পেত। কিন্তু আজও যা, কালও তাই—নীলামওয়ালাকে কমিশনের রেট্ আরও বাড়িয়ে দিতে হয়েচে গাছটা রাখ্‌বার জন্য, নৈলে সে দোকানে রাখ্‌তে চায় না।

হিমাংশুর দুর্ভাবনা এই যে, ও কল্‌কাতা ছেড়ে চলে গেলে গাছটার আর যত্ন হবে না, নীলামওয়ালার দায় পড়েচে, কোথাকার একটা এরিকা পাম্ গাছ বাঁচ্‌ল কি মোলো—অত তদারক করবার তার গরজ নেই।

কিন্তু শেষে বাধ্য হয়ে কল্‌কাতা ছাড়তে হোল হিমাংশুকে।

অনেকদিন পরে সে আবার এল কল্‌কাতায়। নীলামওয়ালার দোকানে বিকেলে গেল গাছ দেখ্‌তে। গাছটা নেই, বিক্রী হয়ে গিয়েচে সাড়ে সাত টাকায়। কমিশন বাদ দিয়ে হিমাংশুর বিশেষ কিছু রৈল না। কিন্তু টাকার জন্যে ওর তত দুঃখ নেই, এত দিন পরে সত্যি সত্যিই গাছটা পরের হয়ে গেল।

তার প্রবল আগ্রহ হোল গাছটা একবার সে দেখে আসে। নীলাম্‌ওয়ালা সাহেব প্রথমে ঠিকানা দিতে রাজী নয়, নানা আপত্তি তুল্‌লে—বহু কষ্টে তাকে বুঝিয়ে ঠিকানা যোগাড় করলে। সার্কুলার রোডের এক সাহেবের বাড়ীতে গাছটা বিক্রী হয়েচে, হিমাংশু পরদিন সকালে সেখানে গেল। সার্কুলার রোডের ধারেই বাড়ী. ছোট গেট্‌ওয়ালা কম্পাউণ্ড, উঠোনের একধারে একটা বাতাবী নেবু গাছ, গেটের কাছে একটা চারা পাকুড় গাছ। সাহেবের গাছ পালার সখ আছে—পাম্ অনেক রকম রেখেছে, তার মধ্যে ওর পাম্‌টাই সকলের বড়। হিমাংশু বলে, সে হাজারটা টবের হাজারটা পামের মধ্যে নিজেরটা চিনে নিতে পারে। কম্পাউণ্ডে ঢুকবার দরকার হোল না, রাস্তার ফুটপাথ থেকেই বেশ দেখা যায়, বারান্দায় উঠ্‌বার পৈঠার ধারেই তার পিপে কাটা টবশুদ্ধ পাম্‌গাছটা বসানো রয়েচে। গাছের চেহারা ভালো—তবে তার কাছে থাকবার সময় আরও বেশী সতেজ, সবুজ ছিল।

হিমাংশুর মনে পড়্‌ল এই গাছটার কবে কোন্ ডাল গজালো—তার খাতায় নোট করা থাক্‌তো। ও বল্‌তে পারে প্রত্যেকটী ডালের জন্মকাহিনী—একদিন তাই ওর মনে ভারী কষ্ট হোল, সেদিন দেখ্‌লে সাহেবের মালী নীচের দিকের ডালগুলো সব কেটে দিয়েচে। মালীকে ডাকিয়ে বল্লে—ডালগুলো ওরকম কেটেচ কেন? মালীটা ভাল মানুষ। বল্লে—আমি কাটিনি বাবু, সাহেব বলে দিল নীচের ডাল না কাট্‌লে ওপরের কচি ডাল জোর পাবে না। বল্লে, টবের গাছ না হোলে ও ডালগুলো আপনা থেকেই ঝরে পড়ে যেতো।

হিমাংশু বল্লে—তোমার সাহেব কিছু জানে না। যা ঝরে যাবার তা তো গিয়েচে, অত বড় গুঁড়িটা বার হয়েচে তবে কি করে? আর ভেঙো না।

বছর তিনি চার কেটে গেল। হিমাংশু গাছের কথা ভুলেচে। সে গালুডি না ঘাটশিলা ওদিকে কোথায় জমি নিয়ে বসবাস করে ফেলেচে ইতিমধ্যে।

গাছপালার মধ্যে দিয়েই ভগবান্ তার উপজীবিকার উপায় করে দিলেন। এখানে হিমাংশু ফুলের চাষ আরম্ভ করে দিলে সুবর্ণরেখার তীরে। মাটীর দেওয়াল তুলে খড়ের বাংলো বাঁধ্‌লে। একদিকে দূরে অনুচ্চ পাহাড়, নিকটে, দূরে শালবন, কাঁকর মাটীর লাল রাস্তা, অপূর্ব্ব সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত।

ফুলের চাষে সে উন্নতি করে ফেল্লে খুব শীগ্‌গীর। ফুলের চেয়েও বেশী উন্নতি করেচে চীনা ঘাস ও ল্যাভেণ্ডার ঘাসের চাষে। এই জীবনই তার চিরদিনের কাম্য ছিল, ও জায়গা ছাড়া সহরে আস্‌তে ইচ্ছেও

হোত না। বছর দুই কাট্‌লো আরও, ইতিমধ্যে সে বিবাহ করেচে, সস্ত্রীক ওখানেই থাকে।

আজ তিন দিন হোল সে কল্‌কাতায় এসেচে প্রায় পাঁচ ছ' বছর পরে।

কাজকর্ম্ম সেরে কেমন একটা ইচ্ছে হোল, ভাবলে—দেখি তো সেই সাহেবের বাড়ীতে আমার সেই গাছটা আছে কি না?

বাড়ীটা চিনে নিতে কষ্ট হোল না কিন্তু অবাক্ হয়ে গেল বাড়ীর সে শ্রী আর নেই। বাড়ীটাতে বোধ হয় মানুষ বাস করেনি বছর দুই—কি তারও বেশী। উঠোনে বন হয়ে গিয়েচে। পৈঠাগুলো ভাঙা, বাতাবী নেবু গাছে মাকড়সার জাল, বারান্দার রেলিংগুলো খসে পড়চে। তার সেই এরিকা পাম্‌টা আছে, কিন্তু কি চেহারাই হয়েচে। আরও বড় হয়েচে বটে কিন্তু সে তেজ নেই, শ্রী নেই, নীচের ডালগুলো শুকিয়ে পাখা হয়ে আছে, ধূলো আর মাকড়সার জালে ভর্ত্তি। যায় যায় অবস্থা। টবও বদ্‌লানো হয়নি আর।

হিমাংশু বল্লে—ভাই সত্যি সত্যি তোমায় বল্‌চি, গাছটা যেন আমায় চিন্‌তে পার্‌লে। আমার মনে হলো ও যেন বল্‌চে, আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি তোমার কাছে গেলে হয় তো এখনও বাঁচ্‌বো। ছেড়ে যেও না এবার। আমায় বাঁচাও।

রাত্রে হিমাংশুর ভালো ঘুম হোল না। আবার সার্কুলার রোডে গেল, সন্ধান নিয়ে জান্‌লে সাহেব মারা গিয়েচে। বুড়ী মেম আছে ইলিয়ট রোডে, পয়সার অভাবে বাড়ী সারাতে পারে না, তাই ভাড়াও হচ্চে না। এই বাজারে ভাঙা বাড়ী কেনার খদ্দেরও নেই।

মেমকে টাকা দিয়ে গাছটাও কিনে নিলে। এখনও সার্কুলার রোডের বাড়ীটাতেই আছে, কাল ও গালুডিতে ফিরে যাবে, গাছটাকে নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে করে।

বিদায় নেবার সময় হিমাংশু বল্লে—বৈঠকখানা বাজারে এসেছিলাম কেন জানো? আমার সাধ হয়েচে ওর বিয়ে দেবো। তাই একটা ছোট খাটো, অল্প বয়সের, দেখ্‌তে ভালো পাম্‌ খুঁজছিলাম। হি—হি পাগল নয় হে পাগল নয়, ভালবাসার জিনিষ হোত তো বুঝ্‌তে।

সার্থকতা

সকাল বেলা। রূপগঞ্জের ভাঙ্গা কালীবাড়ীর সামনে বাঁধানো বটতলায় নিয়মিত আড্ডা বসেচে। এখানে প্রথমেই বলা উচিত, রূপগঞ্জ কোনো ব্যবসার জায়গা নয়,—কোনো কালে ছিল যে, এমন কোনো প্রমাণও নেই। রূপগঞ্জ নিতান্তই সাধারণ ছোট পাড়াগাঁ—দু'শঘর ব্রাহ্মণের বাস ; এ ছাড়া কামার, কুমোর, জেলে ইত্যাদি অন্য জাত আছে। গঞ্জ থাকা তো দূরের কথা, গ্রামে একখানা মাত্র মুদীখানার দোকান। কিন্তু লোকে বারোমাস ধার নিয়ে নিয়ে দোকানের অবস্থা এমন করে তুলেচে, যে, দোকানের মালিক দোকান তুলে দিতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে—অথচ সে বেশ জানে এবং তার খরিদ্দাররাও জানে যে দোকান একবার উঠে গেলে বাকীবকেয়া আদায় হবার আর কোনো আশাই থাকবে না। রূপগঞ্জে সবাই গরীব, পরস্পরকে ঠকিয়ে কোনো রকমে তারা দিন কাটিয়ে চলেচে।

কালীবাড়ীর বটতলায় বসে এই সব কথাই হচ্ছিল—রোজই হয়, আজ ত্রিশবছর ধরে হয়ে আসচে। এর আগে কি হয়েচে না হয়েচে তার হিসেব নেই, কেননা সে-সব লোক এখন বেঁচে নেই। এ-গ্রামে খুব বুড়ো লোক বড় একটা দেখা যায় না—বিশেষ করে ভদ্রলোকের মধ্যে। তার আগেই তাদের রূপগঞ্জের কালীবাড়ীর আড্ডার মায়া কাটতে হয়, পৈতৃক আমন ধানের জমি ও আমবাগানের মায়া কাটাতে

হয়। বিশবছর ধরে গোপনে মনের কোণে পোষণ-করা কাশীবাসের ইচ্ছাও পরিত্যাগ করতে হয়।

পঞ্চু মুখুয্যে তাই দুঃখ করে বল্‌ছিলেনঃ কি জানো নারাণ ভায়া! এই জায়গাজমিগুলোই হয়েচে কাল—নইলে এ-গাঁয়ের মুখে ঝাঁটা মেরে কোন্‌দিন বেরুতাম। এই আমাদের দুঃখু! বিদেশে যারা বেরিয়েচে, তারা বেশ দু'পয়সা—এই ধরো না কেন, সরুলের দীনু ভট্‌চায্যির ছেলে—চেনো তাকে? আরে, অই যে রোগা ঘ্যানা ছোক্‌রা, বোসেদের বাড়ী কালীপূজা দেখতে আস্‌তো—মনে নেই? সে লেখাপড়া তো শিখলে না, একবার তো ম্যালেরিয়ায় মর-মর হলো, তারপর তার মামারা তাকে কোথায় যেন নিয়ে গেল। এখন বেশ সেরে উঠেচে, আর সে পিলে-রোগা চেহারা নেই। সেদিন শুন্‌লাম, রেলে, চাক্‌রী পেয়েচে—পঁয়ত্রিশ টাকা করে মাইনে। থাকে অই মগরা লাইনের ওদিকে যেন কোথায়। উপযুক্ত ভৌগলিক জ্ঞানের অভাবে পঞ্চু মুখুয্যে বর্ণনাটাকে বিশদ করে তুল্‌তে পারলেন না।

হারাণ রায় বল্লেনঃ তোমার সেই চাক্‌রীর কি হোল, পঞ্চু ভায়া?

পঞ্চু মুখুয্যের বয়স পঞ্চাশের ওপর। জীবনে তিনি এ-জেলার গণ্ডী পার হননি, কিন্তু উঠতি বয়েস থেকেই তাঁর ইচ্ছে, বিদেশে কোথাও তিনি চাক্‌রী পেলে করেন। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের মধ্যে এ-আশা পূর্ণ হয়নি। গ্রামের সামান্য সম্পত্তির আয়েই সংসার চলে। যে-ভাবে চলে, তাকে চলা বলা যায় না—অন্য জায়গায় হোলে অচল হোতো, রূপগঞ্জ বলেই চল্‌চে।

তিনি মধ্যে বোসেদের বাড়ী 'হিতবাদী' কাগজে দেখেছিলেন,

কলকাতার কি একটা আপিসে ষাট টাকা মাইনের গুটী দুই তিন চাকুরী খালি আছে—কাজ জানার দরকার হবে না, তারাই শিখিয়ে নেবে। পঞ্চু মুখুয্যে একখানা দরখাস্ত করেছিলেন; কাল বিকেলে তার উত্তর পেয়েচেন।

হারাণ রায়ের প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চু সেই উত্তরের চিঠিখানা মলিন জীর্ণ কামিজের পকেট থেকে বার করে সকলকে দেখিয়ে ম্লানমুখে বল্লেনঃ এই তো তারা চিঠি দিয়েচে— কালকে সকলের হাটে পিয়ন বিলি কল্লে। কিন্তু পাঁচ শো টাকা নগদ জমা চায়! কোথা থেকে দেবো নগদ পাঁচ শো টাকা জমা? পাঁচটা টাকার সংস্থান নেই। নাঃ, ও-সব আমাদের জন্যে নয় হে—

মধু লাহিড়ী নিজের বাড়ী থেকে তামাক সেজে হুঁকো হাতে নিয়ে বটতলায় এসে পৌছলেন। সবাই জানে মধু লাহিড়ী সম্প্রতি কিছু টাকা হাতে পেয়েচেন তাঁর শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে, গত কার্ত্তিক মাসে। এজন্য মধু লাহিড়ীর ওপর কেউ সন্তুষ্ট নয়, মনে মনে সবাই তাঁকে হিংসে করে।

মধু বয়োজ্যেষ্ঠ হারাণ রায়ের হাতে হুঁকো দিয়ে বল্লেনঃ কাল রাত্রে এক কাণ্ড হয়েচে আমার বাড়ী, জানো না বোধহয়? রান্নাঘরের জান্‌লার পাশে অনেক রাত্তিরে কে একজন দাঁড়িয়েছিল—রাম ছাদ থেকে দেখতে পায়। সে বাইরে এসেছিল, ছাদের নীচেই ওপাশে রান্নাঘর। ধপ্‌ধপে জ্যোৎস্না রাত, দেখে যে কালোমত কে একজন জান্‌লার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে। সে ছেলেমানুষ, চেঁচিয়ে উঠতেই আমার স্ত্রীর ঘুম ভেঙেচে। আমারও ঘুম ভেঙেচে। সবাই ছাদে বার হয়ে দেখি, কোথাও কিছু নেই—কিন্তু রান্নাঘরের পেছনে সেওড়াগাছগুলোর

মধ্যে যেন কি শব্দ হচ্ছে! সারা রাত জেগে কাটিয়েচি! গাঁয়ে বাস করা ভার হোল দেখচি!

মধু লাহিড়ীর এ-কথায় কেউ সন্তুষ্ট হোল না। কেউ কথাটা বিশ্বাসও করলে না। সবাই ভাবলে, হাতে টাকা হয়েচে, তাই লোককে জানানো যে আমার বাড়ী চোর যাতায়াত করে রাত্রে—এটা বড়মানুষী দেখানো একরকম।

হারাণ রায় মধুর হাত থেকে হুঁকো নিয়েছিলেন, তিনি চক্ষুলজ্জায় পড়ে বল্লেন: তুমি আবার বাস করো বাঁশবাগানের মধ্যে। রাত-বেরাত খুব সাবধান থাকবে, কাল পড়েচে বড়ই খারাপ।

মধু লাহিড়ী বল্লেন: উঠে যাবো উঠে যাবো করি, কিন্তু উঠে যাই বা কোথায়? একবার তো ভেবেছিলাম, শ্বশুরবাড়ী বল্লাগড় গিয়ে বাস করি। কিন্তু সে বেজায় ম্যালেরিয়ার জায়গা—আমাদের এখানকার চেয়েও বেশী। তাই দাদা বারণ কল্লে, দুই ভায়ে যে ক'দিন বেঁচে থাকি, এক জায়গাতেই থাকি, পৈতৃক ভিটেটাতে আলো দি দু'জনে। তাই—

পঞ্চু মুখুয্যে বল্লেন: না উঠে যাবে কেন? সবাই যদি উঠে যাবে, গাঁয়ে তবে থাকবে কে? তোমাদের বাড়ীর পাশে শ্যামাপদ চাটুয্যেদের ভিটে এখনও পড়ে আছে—তোমরা দেখোনি। আমাদের একটু একটু মনে আছে, শ্যামাপদ চাটুয্যে এখানেই মারা যায়। তার স্ত্রী এখানকার সম্পত্তি বেচে কিনে বাপের বাড়ী চলে গেল, ছ'মাসের ছেলেনিয়ে। অবস্থা ভাল ছিল না, থাকবার মধ্যে ছিল ওই ঘাটের ধারের আমবাগানখানা— এখন মাখন কাকা কিনেচেন। আর কিছু ধানের জমি, তাতে বছর চল্‌তো না। একশো টাকায় সম্পত্তি বিক্রী করে ফেল্লে, রাজকৃষ্ট জ্যাঠা

কিন্‌লেন, আমার বেশ মনে আছে। তারপর এখন আবার মাখন কাকা কিনে নিয়েচেন রাজকৃষ্ট জ্যাঠার ছেলের কাছ থেকে। তবে ফাঁকি দিয়ে কেনা সম্পত্তি, ওর অপবাদ আছে, ও ভোগে আসে না।

হারাণ রায় এখানে সকলের চেয়ে বয়োবৃদ্ধ। তিনি বল্লেন: অনেক দিন পরে শ্যামাপদর কথাটা উঠ্‌লো। শ্যামাপদদা আমাদের চেয়ে দশ পনোরো বছরের বড় ছিল। তা'হোলেও একসঙ্গে ছিপে মাছ ধরতে গিয়েছি খাঁ'দের পুকুরে। আহা, অল্প বয়সে মরে গেল। হ্যাঁহে, তার সে ছেলেটা বেঁচে আছে কিনা জানো? তার অন্নপ্রাশনে নেমতন্ন খেয়ে এসেচি, বেশ মনে আছে। ছেলের মুখে ভাত দে'ওয়ার মাস দুই পরেই শ্যামপদদা মলো। আহা, সে সব কি আজকের কথা!

পঞ্চু বল্লেন: না। তাদের আর কোনো খবরই পাওয়া যায় নি অনেককাল।

মধু লাহিড়ী বল্লেন: কি জানো, একবার এ গাঁ থেকে বেরুলে আর কি কেউ ফিরতে চায়? এই আমাদেরই যদি অন্য উপায় থাক্‌তো, তবে কি আর এখানে পড়ে থাক্‌তে যেতুম? এই যে আমার বাড়ি কাল রাত্তিরে কাণ্ডটা হয়ে গেল—মধু লাহিড়ীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই পঞ্চু অসহিষ্ণুভাবে কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পথের মোড়ে হঠাৎ মোটর গাড়ীর হর্ণের আওয়াজে তিনি এবং উপস্থিত সবাই সেদিকে চেয়ে রইলেন। এবং চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তেই প্রকাণ্ড একখানা নতুন মোটর বটতলায় এসে দাঁড়িয়ে গেল।

মোটর গাড়ী যে এ-গ্রামে আসে না তা' নয়, তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী ষ্টেশন থেকে মাঝে মাঝে গ্রামের কোনো নতুন জামাই সখ করে ট্যাক্সি

ভাড়া করে এসেচে, শক্ত অসুখে পড়লে কেউ মহকুমা থেকে ডাক্তার অনেকবার এসেচে নিজের মোটরে কিন্তু এ-ধরণের বড় ও সুন্দর মোটর গাড়ী উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেউ দেখেনি। লম্বা ধরণের প্রকাণ্ড গাড়ী, পালিশ-করা নিকেলের পাতের বনেট, দোরের হাতল-ল্যাম্প—সবই ঝক্‌ঝকে; তবে গাড়ীর পেছনে ও মাড্-গার্ডে রাঙা ধূলো জমেচে—যেন অনেক দূর থেকে আসূচে।

একজন ত্রিশ বত্রিশ বছরের যুবক গাড়ী চালাচ্ছিল—দোহারা গড়ন, গায়ে সাদা সিল্কের পাঞ্জাবী; মাথায় একমাথা ধূলো। সে নেমে বটতলার দিকে এগিয়ে এল—এবং অল্পক্ষণ উপস্থিত সবারই মুখের দিকে উৎসুক চোখে চেয়ে কি যেন চেন্‌বার চেষ্টা করলে। তারপর হঠাৎ পঞ্চুর মুখের ওপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করে বল্লেঃ এই যে কাকা! আমায় চিন্‌তে পারচেন না?

হারাণ রায়ের দিকে চেয়ে বল্লেঃ কাকা, আমায় মনে নেই আপনার? আমি ননী, আমার পিতার নাম ছিল রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনাদের পাড়াতেই—

হারাণ রায় বিস্ময়ে কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। পঞ্চুও তাই। দু'জনেই সমস্বরে, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে, যেন অনেকটা আপন মনেই বলে উঠলেনঃ রাজেনদা'র ছেলে সেই ননী!

এর বেশী কথা তাঁদের মুখ দিয়ে বার হোল না। ইতিমধ্যে ননী উপস্থিত সকলেরই পায়ের ধুলো দিয়ে প্রণাম করলে। হারাণ রায় নিজের কোঁচা দিয়ে ঝেড়ে বাঁধানো বেদীর এক অংশে তাকে হাত ধরে বসালেন। নানা সাগ্রহ প্রশ্নোত্তরের আদানপ্রদান চল্‌তে লাগল।

হাঁ, রাজেন বাঁডুয্যেকে কার মনে নেই ? বেশীদিনের কথা তো নয়, বড় জোর কুড়ি বছর আগে রাজেন মারা যায়। রাজেনের ছেলে এই ননী তখন দশ বারো বছরের ছেলে। এই মাঠে কালীতলায় লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করে বেড়াতো—সবাই দেখেচে। রাজেন বাঁডুয্যে মহকুমার রেজেষ্ট্রী আফিসে দলিল-লেখক ছিল। সেখানে শশীউকিলের বাসায় থাকতো। সপ্তাহের শেষে শনিবার সন্ধ্যার সময় পিঠে এক ক্যাম্বিসের ব্যাগ ঝুলিয়ে, এক পা ধূলো নিয়ে বাড়ী আসতো—আবার সোমবার ভোর বেলা মহকুমায় ফিরতো। বিশ বছর আগে রাজেন্ বাঁডুয্যের লাঠির আগায় কেম্বিসের ব্যাগ-ঝুলান মূর্ত্তি গ্রামের পথে ঘাটে অতি সুপরিচিত ছিল। একদিন হঠাৎ খবর এল, কলেরা হয়ে রাজেন্ শশী উকীলের বাসাতেই মারা গিয়েচে। ননীর মা তার পরও বছর দুই এগাঁয়ে ছিল. কিন্তু শেষকালে চলাচল্তির কোন উপায় না দেখে এখান থেকে চন্দননগরে ভগ্নিপতির ওখানে চলে যায়। তারপর আর কোন খবর কেউ রাখে না তাদের।

সেই ননী আজ এতকাল পরে ফিরে এল নতুন মোটরে চড়ে।

বিস্ময়ের প্রথম মূহূর্ত্ত কেটে গেলে সবাই দেখলেন, গাড়ীর পেছনের সিটে একটী মহিলা ও দু'টি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। হারাণ বল্লেন: সঙ্গে কে ননী ?......বৌমা ? আরে ছি ছি, কি ছেলেমানুষ! এসো, এসো, নামিয়ে নিয়ে এসো। এই রদ্দুরে কিনা—এই কাছেই তোমার গরীব কাকার বাড়ী, এসো বৌমাকে আমার নিয়ে এসো। পঞ্চু উত্তেজিত ভাবে বল্লেন: তা কি কখনো হয় ? আমার সঙ্গেই বাবাজীর প্রথমে কথা হোল—আমার বাড়ীতেই এ-বেলাটা অন্ততঃ—

শেষে হারাণ রায়ই জয়ী হয়ে বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল মুখে ননী ও তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

বিদ্যুৎবেগে এ-সংবাদ গ্রামময় রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারাণ রায়ের বাড়ীতে রথযাত্রার ভিড় শুরু হোল। ননীর স্ত্রী বেশ সুন্দরী, একটু মোটাসোটা, কথাবার্ত্তায় খুব অমায়িক, বড়মানষী চালচলন একেবারে নেই। ননীকে ছেলেবেলায় দেখচে, এমন অনেক লোকই গাঁয়ে আছে —সবাই বলাবলি করতে লাগ্‌লো: একেই বলে অদেষ্ট! ওর মা ওর হাত ধরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গাঁ ছেড়ে গিয়েছিল, আর আজ দ্যাখো কাণ্ড! ভগবান যাকে যখন দ্যান্—ইত্যাদি।

পঞ্চু বল্লেন: আহা, সকাল বেলাতেই তো বলছিলাম, এ গাঁ ছেড়ে যে বাইরে পা দিয়েচে সে-ই উন্নতি করেচে—কেউ বেশী, কেউ কম। আজ যদি আমি গাঁয়ে বসে থেকে নিজেকে মাটী না করি, তবে আমার কি এ-দশা হয়? না—এবার বেরুতে হবে। দেখি একবার ননী বাবাজীকেই বলে দেখি, যদি কিছু যোগাড় টোগাড় করে দিতে পারে।

ননীর অবস্থা পরিবর্ত্তনে গ্রামের কেহই অসুখী নয়, বরং সকলেই আনন্দিত। কারণ ননীর সঙ্গে এ গ্রামের কারো স্বার্থের সংঘাত নেই, ননী এখানে বাসও করে না—তা'ছাড়া সবাই ননীকে শেষবার যখন দেখেচে তখন ননী ছিল ছোট ছেলে—তার সম্পর্কে কোনো হিংসাদ্বন্দ্বের স্মৃতি কারো মনে গড়ে ওঠেনি—ছোট ছেলের ওপর স্নেহের স্মৃতি ছাড়া।

বিকেলে বাঁধানো বটতলায় প্রকাণ্ড মজ্‌লিস্ বসেচে—মাঝখানে গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে বসে ননী—তাকে গোল্লাকারে ঘিরে গাঁয়ের

বালক, বৃদ্ধ ও যুবার দল। কি ক'রে সে বড়লোক হোল, এ কথা সবাই শুন্‌তে চায়।

শ্রীপতি কর্ম্মকার ওপাড়ার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তামাকের ব্যবসা করে তিনি হাতে দু'পয়সা জমিয়েচেন সবাই বলে, যদিও শ্রীপতি তা স্বীকার করেন না। শ্রীপতির সঙ্গে ননীর বাবা রাজেন্ বাঁড়ুযোর খুব বন্ধুত্ব ছিল, ননীর আসবার খবর পেয়ে তিনি পায়ের বাত সত্ত্বেও ওপাড়া থেকে এসেচেন দেখা করতে। শ্রীপতি জিগ্যেস করলেন—তা বাবাজির এখন থাকা হয় কি কল্‌কাতাতেই?

—আজ্ঞে না, আমি থাকি হোসঙ্গাবাদ, নর্ম্মদার ধারে, সি, পি—সেখানেই আমার কাঠের গোলা আর আপিস্। কল্‌কাতাতে এসেছিলাম—একটু কাজও ছিল, আর একখানা মোটর কিন্‌বো বলে। কাল তাই ভাব্‌লাম গাড়ীখানা তো কেনা হোল, একবার এতে করে গিয়ে পৈতৃক ভিটেটা দেখে আসি।

বলা বাহুল্য ননী কোথায় থাকে সে কথা কেউ বুঝ্‌তে পারলেন না, নর্ম্মদা নামে একটা নদীর কথা অনেকে কাশীরাম দাসের মহাভারতের মধ্যে পড়েচেন—কিন্তু তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে এঁদের ধারণা কুয়াসাচ্ছন্ন শীতের প্রভাতে সমুদ্রবক্ষ থেকে দৃশ্যমান দূরের তীররেখার চেয়ে স্পষ্টতর নয়। পঞ্চু মুখুয্যে একটা সোজা প্রশ্ন জিগ্যেস্ কর্‌লেন—বিয়ে করেচ কোথায় বাবাজি?

—ওই হোসঙ্গাবাদেই, আমার শ্বশুর ওখানকার ডাক্তার। বহুদিন সেখানে বাস করেচেন, তবে কল্‌কাতায় সব আত্মীয়স্বজন আছে তাঁদের।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দু'দিন কেটে গেল। এক বেলা থাক্‌বার জন্যে ননী এসেছিল এখানে…কিন্তু শৈশবের শত স্মৃতি মাখানো গ্রামকে হঠাৎ ছেড়ে যেতে তার সাধ্যে কুলিয়ে উঠ্‌ল না। ননীর এক ছোট ভাই ছিল বোবা ও কালা, তিনবছর বয়েসে বর্ষার সময় ননীদের বাড়ীর পেছনে ডোবার জলে ডুবে মারা গিয়েছিল; মৃতদেহ যখন ভেসে উঠেছিল তখন জানা যায়, তার আগে হারিয়ে গিয়েচে বলে এ পাড়া ওপাড়া খোঁজ হচ্ছিল।

সেই ডোবাটী তেমনি আছে। এ-সব পাড়াগাঁয়ে কোনো কিছু হঠাৎ বদ্‌লায় না, হয়তো আরও বিশ বছর ডোবাটা থাক্‌বে, হয়তো আরও পঞ্চাশ বছর থাক্‌বে। ননীর বয়েস তখন ছ'বছর, কিন্তু সে বর্ষা-দিনের কথা আজও তার বেশ মনে আছে—কখনও কি ভুল্‌বে? ওপারের ওই ডুমুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ননীর বাবা, এপারে লোকে লোকারণ্য হয়েছিল। জলবুদ্‌বুদে তার কিসের বাঁধন আছে? কিছুই না—সে দু'দিনের বাঁধন। এখানকার সঙ্গে সম্বন্ধ অনেক গভীর এতদিন আসেনি, তাই ভুলে ছিল। আজ সেই তিন বছরের অবোধ বোবা কালা ছোট ভাইয়ের করুণ মুখখানি তার মনে স্পষ্ট হয়ে ফুটলো — সে কি ভাবে তার দিকে চাইতো, তার সে বুদ্ধিহীন দৃষ্টি, নাকের সেই তিলটি—আশ্চর্য্য! মানুষের এতও মনে থাকে!

সমস্ত জীবনটা ননী যেন এক মুহূর্ত্তে একটা ম্যাপের মত চোখের সাম্‌নে পড়ে আছে দেখ্‌তে পেলে। প্রথম জীবনের দারিদ্র্য, প্রথম বিদেশযাত্রা, ব্যবসাতে উন্নতি, বিবাহ—তার মনে হোল, যাকে সে এতদিন সাফল্য ভেবে আত্মপ্রসাদলাভ করে এসেছে, জীবনে আসলে

তার মূল্য কি ! তার যেন আজ একটা নতুন চোখ খুলেচে, জীবনের পাতাগুলো নতুনভাবে পড়তে শিখেচে, জীবনে যা নিয়ে এতদিন সে ভুলে আছে আজ মনে হচ্চে তা ভেতরের সম্পদ নয়, বাইরের পালিশ মাত্র।

তাও নয়। জীবনটা যেন এতদিন জ্যামিতির সরল রেখার মত প্রস্থবিহীন, গভীরতাবিহীন একটা পথে চলে এসেচে—গভীরতর অনুভূতির অভাবে সে বুঝতে পারেনি যে জীবনের আর একটা বিস্তার আছে আর একদিকে, সেটা তার গভীরতা। নিজের মনের মধ্যে ডুব দেওয়ার অবকাশ কখনো তো হয়নি !

যে-পথ দিয়ে নেমে গেলে সরোবরের গভীর অন্ধকারতলে-লুকোনো মায়াপুরীর সন্ধান মেলে—তার সোপানশ্রেণী অস্পষ্ট নজরে পড়েচে, কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে, এমন অসময়ে নজরে পড়লেই কি বা না পড়লেই কি ?

তাকে ফিরে যেতে হবে। কাঠের হিসাব ঠিক করতে হবে, ফরেষ্ট অফিসারদের সাথে দেখা করে নতুন জঙ্গল ইজারা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, ব্যবসাকে আরও বাড়াবার চেষ্টা পেতে হবে, ব্যাঙ্কে জমানো টাকার অঙ্ককে বাড়াতে হবে। আরও কত শত দরকারী কাজ তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে হোসেঙ্গাবাদের কাঠের গোলায়।

এখন নতুন পথ ধরে চলবার মত সময়ও নেই, বয়েসও নেই। সাফল্যের আলেয়া তাকে ব্যর্থতার যে-পথে পথ ভুলিয়ে নিয়ে চলেচে —সেই পথই তার পথ।

তবু এই দিনটী সে ভুলবে না। এই ম্লান মেঘলা দুপুরের আলো,

এই প্রাচীন জগডুমুর গাছটা, এই পানা-শেওলা-ভরা ডোবা এই আশ্চর্য্য অদ্ভুত জীবনমুহূর্ত্তটী স্বপ্নের মত মনে আসবে বহুদূর উত্তরকালের মানসপটে।

সকলের প্রশংসাবাদের মধ্যে ননী একদিন গ্রামের বারোয়ারী ফণ্ডে শ'দুই টাকা দিলে। গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করে হারাণ রায়ের বাড়ীতে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করলে। একটা অনাথা বিধবাকে মাসিক কিছু সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলে। এক সপ্তাহ প্রায় কেটে গেল। ননীর স্ত্রী আর থাক্‌তে চায় না, ম্যালেরিয়ার দেশ, ছেলেমেয়ের শরীর খারাপ হবে—তা ছাড়া হারাণ রায়ের বাড়ী তেমন ঘরদোর নেই, থাক্‌বারও কষ্ট।

নতুন মোটরগাড়ী চালিয়ে হারাণ রায়ের বাড়ীশুদ্ধ সকলের এবং পাড়ার সবারই চোখের জলের মধ্যে ননী গ্রাম থেকে বিদায় নিলে।

পঞ্চু মুখুয্যে বল্লেন: একেই বলে ছেলে! বিদেশে না বেরুলে কি পয়সা হয় বাপু? দেখে নিলে তো চোখের ওপর? তা তোমাদের বলি, তোমরা তো শুন্‌বে না? গাঁয়ে কারুর কিছু নেই, তাই মধু লাহিড়ী মুখের সাম্‌নে বড়মানুষী চালে কথা বলে পার পায়। দেখি, এবার বেরিয়ে একটা কিছু যদি –

একটিদিন

মনটা ভাল ছিল না। এক এক দিন এরকম হয়, কিছু পড়তে ভাল লাগে না, কিছু ভাবতে ভাল লাগে না, কারুর সঙ্গে কথা বলতেও ভাল লাগে না। মনে হয় যেন মনের চাকার তেল ফুরিয়ে গিয়েচে—'অয়েল' না করে নিলে চা'কা আর চলবে না, ক্রমে মরচে পড়ে আস্‌বে—তারপর কবে একদিন ফুট্ করে বন্ধ হয়ে যাবে।

জেলেপাড়া লেনে এক পুরোণো তাসের আড্ডায় গেলুম। সেই সব পুরোণো বন্ধুরা এসে জুটেচে—তাস কিন্তু ভাল লাগ্‌ল না। তাস্ খেলে জিতবো, অন্যদিন এতে কত উৎসাহ, আনন্দ পাই। আজ মনে হোল, না হয় জিতলামই, তাতেই বা কি?—এদের গল্পগুজব ভাল লাগ্‌ল না। অর্থহীন—অর্থহীন—এই, নীচু বৈঠকখানা ঘর, চূণবালিখসা দেওয়াল, সেই সব একঘেয়ে সস্তা ওলিওগ্রাফ্ ছবি—কালীয়দমন, অন্নপূর্ণার ভিক্ষাদান, কি একটা মাথামুণ্ডু ল্যাণ্ডস্কেপ—সেই একঘেয়ে কথাবার্ত্তা, চিরকাল যা শুনে আস্‌চি—হঠাৎ মন বিরস ও বিরূপ হয়ে উঠল—সব বাজে, সব অর্থহীন,—পাশের একজনকে জিগ্যেস কল্লুম—আপনার বেশ ভাল লাগ্‌চে? মনে কোনোরকম—

সে অবাক্ হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। বল্লে—কেন, ভাল লাগ্‌চে না কেন? কেন বলুন তো?—

মন আরও তিক্ত হয়ে উঠল। কাজের ছুতোয় সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লুম। বেলা চারটে বাজে। ফিরিওয়ালারা গলির মধ্যে

হাঁক্‌চে—ছেলেরা বইদপ্তর দিয়ে স্কুল থেকে ফিরচে—কলে জল পড়বার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—গলির মোড়ে রোয়াকে-রোয়াকে এরই মধ্যে আড্ডা বসে গিয়েচে।

একটা নিতান্ত সরু অন্ধকার গলি, পাশেই একটা মিউনিসিপ্যালিটির নাইবার জায়গা। এই গলিটা দিয়ে যাতায়াত প্রায়ই করি—মিউনিসিপ্যালিটির নাইবার জায়গাটার পাশে একটা খোলার ঘর। এই ঘরখানা ও তার অধিবাসীরা আমার কাছে বড় কৌতুহলের জিনিষ। হাত পাঁচেক লম্বা, চওড়াতে ওই রকমই হবে, এইতো ঘরখানা। এরই মধ্যে একটি পরিবার থাকে, স্বামী স্ত্রী ও দুটি শিশুসন্তান। না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত এইটুকু ঘরে কি ভাবে এতগুলি প্রাণী থাকে—তাদের জিনিষপত্র নিয়ে। কিন্তু সকলের চেয়ে অবিশ্বাসের বিষয় এই যে ওই পাঁচ বর্গহাত ঘরের এক কোণেই ওদের রান্নাঘর। আমি যখন ওখান দিয়ে যাই, প্রায়ই দেখতে পাই—উনুনে কিছু না কিছু একটা চাপানো আছে। বৌটি ছোট্ট ছেলে কোলে নিয়ে রাঁধচে না হয় দুধ জ্বাল দিচ্চে! তার বয়েস দেখলে বোঝা যায় না, তেইশও হতে পারে, ত্রিশও হতে পারে চল্লিশও হতে পারে। ঘোমটার কাছে ছেঁড়া, আধময়লা সাড়ী পরণে। হাতে রাঙা কড় কি রুলি। চোখ মুখ নিষ্প্রভ, নির্ব্বুদ্ধিতার ছায়া মাখানো। স্বামী বোধহয় কোনো কারখানাতে মিস্ত্রীর কাজ করে, দু'একদিন সন্ধ্যার আগে ফিরবার সময় দেখেচি লোকটা কালিঝুলি মেখে ছোট্ট বাল্‌তি হাতে পাশের নাইবার জায়গায় ঢুক্‌চে।

আজও ওদের দেখলুম। দোরের কাছে বৌটি ছেলে কোলে নিয়ে বসে আছে, ছেলেকে আদর করচে। নির্ব্বোধের মত আমার দিকে এক-

বার চেয়ে দেখলে। সেই পায়রার খোপের মত ঘরটা, ছিটেবেড়ার দেওয়ালে মাটীর লেপ, তার ওপরে পুরোণো খবরের কাগজ আঁটা, কাগজগুলো হল্‌দে, বিবর্ণ হয়ে গিয়েচে—দড়ির আল্‌নায় ময়লা কাপড়-চোপড় ঝুল্‌চে।

মনটা আরও দমে গেল। কি ক'রে এরা এ থেকে আনন্দ পায়? কি ক'রে আছে? কি অর্থহীন অস্তিত্ব! কেন আছে? আচ্ছা, ও ছেলেটা বড় হয়ে কি হবে? ওই রকম মিস্ত্রী হবে তো, ওই রকমই খোলার ঘরে ছেলে বউ নিয়ে ওই ভাবেই মলিন, কুশ্রী, অন্ধকার, অর্থহীন জীবনের দিনগুলো একে একে কাটাতে কাটাতে এগিয়ে চল্‌বে ততোধিক দীন, হীন মরণের দিকে। অথচ মা কত আগ্রহে খোকাকে বুকে আঁক্‌ড়ে আদর করচে, কত আশা, কত মধুর স্বপ্ন হয়তো—কিন্তু এখানেও আমার সন্দেহ এল। স্বপ্ন দেখবার মত বুদ্ধিও বৌটির আছে কি? কল্পনা আছে? নিজেকে এমন অবস্থায় ভাবতে পারে যা বর্ত্তমানে নেই কিন্তু ভবিষ্যতে হতে পারে বলে ওর বিশ্বাস? মনের গোপন সাধ-আশাকে মনে রূপ দিতে পারে? নিজের সংকীর্ণ, অসুন্দর বর্ত্তমানকে আলোক-উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মধ্যে হারিয়ে ফেল্‌তে পারে?

বড় রাস্তার মোড়ে বইএর দোকানগুলো দেখে বেড়ালুম। রাশি রাশি পুরোণো বই, ম্যাগাজিন। অধিকাংশই বাজে। অলস, অপরিণত মনের তৈরী জিনিষ। চটকদার মলাট-ওয়ালা অসার বিলিতি নভেল, সিনেমার ম্যাগাজিন ইত্যাদি। অন্যদিন এখানে বেছে বেছে দেখি, যদি ভালো কিছু পাওয়া যায়। আজ আর বাছবার মত ধৈর্য্য ছিল না। মনের আকাশের চেহারা আজ ঘসা পয়সার মত, নীলিমার

সৌন্দর্য্য তো নেই-ই, মেঘভরা বাদল-দিনের রূপও নেই—নিতান্তই ঘসা-পয়সার মত তার চেহারা।

সিনেমা দেখতে যাবো? আউট্রাম ঘাটে বেড়াতে যাবো? কোথাও বসে খুব গরম গরম চা খাবো? লেকের দিকে যাবো?—

ধর্ম্মতলার গির্জ্জার সাম্‌নে একজায়গায় লোকের ভিড় জমেছে। একটা সাহেবী পোষাক-পরা লোক ফুটপাথে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছে, ধড়টা ও মাথাটা পরস্পরের সঙ্গে এমন অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেচে, যে মনে হচ্ছে লোকটা মরে গিয়েছে। দুজন সার্জ্জেণ্ট এল। লোকে বল্লে, সামনের বাড়ীর নীচের তলায় ওই বাথ্‌রুমের মধ্যে পড়েছিল এই অবস্থায় বাড়ীর দারোয়ান ধরাধরি করে ফুটপাথে এনে শুইয়ে দিয়েচে—লোকটা কে, তারা চেনে না। লোকটা মরে নি, মদে বেহুঁস্ হয়ে আছে। সার্জ্জেণ্ট দুজন ধরাধরি করে তার সংজ্ঞাহীন নিঃসাড় দেহটা একটা ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে কোথায় গেল।—

লোকটার ওপর সহানুভূতি হোল আমার। সেই নির্ব্বোধ বধূটার ওপর যা হয়নি, এই বেহুঁস্ মাতালের ওপর তা হোল। বেচারা আনন্দের খোঁজে বেরিয়েছিল, পথও যা হয় একটা ধরেছিল, হয়তো ভুল পথ, হয়তো সত্যি পথ···আনন্দের সত্যতা তার মাপকাঠি—কে বল্‌বে ওর কি অভিজ্ঞতা, কি তার মূল্য? ওই জানে। কিন্তু ও তো বেহুঁস্।

কর্জ্জন-পার্কের সামনে এলুম। অনেকগুলো চাকর ও আয়া সাহেবদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বৃষ্টির ভয়ে গাড়ী-বারান্দার নীচে ফুটপাথের ওপর বসে আছে। বৃষ্টি একটু একটু বাড়চে, আমিও সেখানে দাঁড়ালুম। একটা ছোট্ট ছেলে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া সোনালী চুল,

নীল চোখ, বছর দেড় কি দুই বয়েস—সে তার চাকরের টুপিটা মাটী থেকে তুলে নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে উঠে অতিকষ্টে নাগাল পেয়ে চাকরের মাথায় টুপিটা পরিয়ে দিচ্ছে—আর যেমন পরানো হয়ে যাচ্ছে, অমনি হাত নেড়ে, নেচে, ঘাড় দুলিয়ে দন্তহীন মুখে হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। কিন্তু টুপিটা ভাল করে মাথায় বসাতে পারচে না, একটু পরেই গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, আবার খোকা অতি কষ্টে টুপিটা মাথায় তুলে দিচ্ছে··· আবার সেই হাসি, সেই হাত পা নাড়া, সেই নাচ...তাকে কেউ দেখ্‌চে না, কারুর দেখবার সে অপেক্ষাও রাখ্‌চে না, তার চাকর পার্শ্ববর্ত্তিনী আয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে এমন অন্যমনস্ক, খোকা কি করচে না করচে সেদিকে তার আদৌ খেয়াল নেই, নিকটের অন্য অন্য ছেলেমেয়েরাও নিতান্ত শিশু—ওই খোকাটি আপন মনে বার বার টুপি পরানো খেলা করচে।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলুম। নরম নরম কচি হাত পায়ের সে কি ছন্দ, কি প্রকাশভঙ্গির সজীবতা, কি অবোধ উল্লাস, কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য !...খুসির আতিশয্যে খোকা আবার সাম্‌নে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়চে, একগাল হাসচে, ছোট ছোট মুঠি বাঁধা হাত দুটো একবার তুল্‌চে, একবার নামাচ্ছে ..শিশু মনের আগ্রহভরা উল্লাসের সে কি বিচিত্র, কি সুস্পষ্ট, ভাষাহীন বার্ত্তা !···

আমি আর চোখ ফেরাতে পারিনি। হঠাৎ অদৃষ্টপূর্ব্ব, অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য্যের সাম্‌নে পড়ে গিয়েছি যেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম হঠাৎ চাকরটার হুঁস্ হোল—সে আয়ার সঙ্গে গল্প বন্ধ করে খোকার দিকে ফিরে টুপিটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পাশে একটা পিরাম্ব-

লেটারের মধ্যে রেখে দিলে। খোকার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। সে টল্‌তে টল্‌তে পিরাম্বুলেটারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল কিন্তু বড্ড উঁচু—তার ছোট্ট হাত দুটি সেখানে পৌঁছায় না। সে একবার অসহায় ভাবে এদিক-ওদিক চাইলে, তারপর থপ্ করে বসে পড়ল চাকরটা আয়ার সঙ্গে গল্পে মত্ত।

কর্জ্জন-পার্কের বেঞ্চির ওপর গিয়ে বসলুম। সূর্য্য অস্ত যাচ্চে গঙ্গার অপর পারে আকাশ রাঙা হয়ে এসেচে।

খোকার মনের সে অর্থহীন আনন্দ আমার মনে অলক্ষিতে কখন সংক্রামিত হয়েচে দেখলুম। খোলার ঘরের মেয়েটিকে আর নির্ব্বোধ মনে হোল না।

বাইশ বছর

খবরের কাগজের অফিসে সন্ধ্যার পর আড্ডা চল্‌ছিল। 'তরুণ' শব্দটার ওপর ভয়ানক জোর দিয়ে কথা বলা তখন দিনকতক খুব চ'লেছিল—সেই সময়কার ব্যাপার। তরুণ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, তারুণ্য, তরুণ দৃষ্টি-ভঙ্গি, তরুণ সমিতি, তরুণের অভিযান, তরুণের জয়যাত্রা—মাসিক পত্রিকা ও কথাসাহিত্য তখন তরুণ-বায়ুগ্রস্ত। ওদিকে পরশুরাম তখন 'কচি সংসদ' গল্প লিখ্‌লেন তা নিয়ে দুটো দলের সৃষ্টি হোল, একজন বল্‌লে আঃ কি ঠোকাই ঠুকেচে! আর একজন বল্‌লে—যাদের নিজেদের জীবনের পুঁজি বহুকাল ফুরিয়েচে, যাদের প্রাণের তীরে মর্‌চে ধরেচে, তারা তরুণের মনকে বুঝ্‌বে কেমন করে? সমস্ত মহী গ্রাস করতে ছুটেছে তরুণের জয়রথ চক্র, তার উদ্দাম, অশান্ত বেগের সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা ধরে, তাদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চ'লবার স্পর্দ্ধা রাখে কোন্ ওল্ড ফসিল্?···ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটের ওপর শেষের দলটাই বেশী পুষ্ট—তরুণের বিরুদ্ধে যারা কথা বলছিল চেয়ে দেখলুম তারা সকলেই মধ্যবয়সী, অপর পক্ষে তরুণ ও প্রৌঢ় দুইই আছে—এবং স্বয়ং সম্পাদক যিনি, ষাট্ বৎসরের বৃদ্ধ হলেও তিনি ছিলেন তরুণের সপক্ষে।

কাগজের আপিস্ থেকে বার হয়ে এসে একটা পার্কের বেঞ্চিতে বস্‌লুম। মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। সত্যিই তরুণেরাই জয়ী—কিন্তু সে বয়সটাকে বহুকাল হারিয়েচি। মাথার চুল ছ আনা আন্দাজ পাকা,

পরিচিত ছোক্‌রারদল সামনে বিড়ি-সিগারেট খায় না, হঠাৎ সাম্‌না সাম্‌নি হোয়ে গেলে বিড়ি মুখে থাক্‌লে তাড়াতাড়ি ফেলে দেয়। সমীহ করে কথা বলে—আর বয়োবৃদ্ধ লোকের পরিচয় দিতে গেলেই বলে,—"আজ্ঞে তাঁর বয়েস হয়েচে, এই প্রায় আপনার বইসী হবেন।" তা সে কি জানে চল্লিশ, কি জানে পঞ্চাশ—আমার বয়েসী, তাও 'প্রায়'—অর্থাৎ আমিই বড়। কারণ কুড়ি, বাইশ, পঁচিশ বয়সের ছোক্‌রারা চল্লিশে আর পঞ্চাশে বিশেষ কোনো তফাৎ দেখে না। এদিকে বাড়ীতেও বড় সংসার, সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে 'বাবা' 'বাবা' অনবরত শুন্‌তে শুন্‌তে মনটাও অনেকটা গম্ভীর প্রবীণত্বের দিকে ঝুঁকে চলেচে বৈকি। ছোট মেয়েটা কাছে এলেই বলে—বাবা তোমার পাকা চুল তুলে দেবো ?

নাঃ, মনটা খারাপ হবারই কথা বটে। রাত ক্রমে বেশী হোল, পার্কের মধ্যে কুলপীবরফওয়ালা হেঁকে যাচ্চে, মোড়ের মাথায় বেলফুলের মালা বিক্রি হচ্চে, রাস্তায় লোক চলাচল ক্রমে কমে আস্‌চে। জ্যোৎস্না-রাত, চাঁদ ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের মধ্যে লুকোচুরী খেল্‌চে।

কত বছর বয়েসের মানুষকে ঠিক তরুণ বলা চলে ? উনিশ থেকে বত্রিশ না আঠারো থেকে আটাশ, না কুড়ি থেকে পঁচিশ ? এবয়েস একদিন আমারও ছিল—ওঁর চেয়েও কম ছিল। কিন্তু তখন কেউ বলে দেয়নি যে আমি তরুণ বা তার জন্যে একটা কিছু হয়েচে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তার উল্টোটাই শুনে এসেচি চিরকাল। কখনও বুঝতে পারিনি যে আমার বয়স অল্প।

সেই কথাটাই আজ রাত্রে আমার বেশী করে মনে এল।

বাইশ বছর

ছেলেবেলায় আমি ছিলাম খুব রোগা শীর্ণ—অসুখে ভুগতাম বছরে ন' মাস। হাতে তাবিজ-কবজ, গলায় আমড়ার আঁটি, কোমরের ঘুন্‌সিতে বাদুড় নখ—সমস্ত দেহে নানা ধরণের বাধা ও গণ্ডী—মৃত্যু যাতে হঠাৎ ডিঙ্গিয়ে এসে আমাকে নিয়ে না পালায়।

এই কারণে ইস্কুলে ভর্ত্তি হতে হয়ে গেল দেরী। যে ক্লাসে গিয়ে ভর্ত্তি হলুম, সে ক্লাসের মধ্যে আমিই বড়। সকলে আমাকে ডাক্‌তে লাগল —'কানু-দা' বলে। কিন্তু প্রথমে ততটা বুঝতে পারিনি যে আমার বয়েসটা এমন বেখাপ্পা গোছের বেশী। একদিন হোল কি, তখন মাস দুই ভর্ত্তি হয়েচি, মামারবাড়ী যাওয়াতে দিন তিনেক ইস্কুল কামাই হোল—তারপর যেদিন ইস্কুলে গেলাম, ফণিমাষ্টারের ক্লাসের পড়া হোল না। ফণিমাষ্টার আমার চুল ধরে টেনে বল্লে—বুড়োধাড়ী কোথাকার, শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশেচে—আবার ইস্কুল কামাই করে! ছেলেরা অনেকে খিল্-খিল্ করে হেসে উঠ্‌ল আমার দুর্দ্দশায় খুসি হয়ে। বাবার আপিসের পেন্সিলের ও 'পেন্সিল-ঘসা' রবারের প্রত্যাশা রাখ্‌তো যে সব ছেলে, তারাই চুপ করে রইল। এই আমি প্রথম জান্‌লুম যে আমার বয়েস বেশী। এর আগে কেউ আমাকে এ-কথা বলেনি। বাড়ীতে দিদি ছিলেন আমার চেয়ে বড়। মা বাবা এদের মুখে কখনও আমার বয়েস সম্বন্ধে শ্লেষ-সূচক কোনো কথা শুনিনি। কিন্তু আজ থেকে আমার ধারণা বদ্‌লে গেল—তখন বুঝলাম কেন ক্লাসের ছেলেরা আমায় 'কানুদা' বলে ডাকে। এবং এই দিনটি থেকে ক্লাসের পড়া না বল্‌তে পারার অক্ষমতার চেয়েও আমার বয়েসের লজ্জায় সবসময় সঙ্কুচিত হ'য়ে থাক্‌তুম। ফণিমাষ্টারও কি প্রতিবারেই প্রতি পদে পদেই আমার সে গোপন লজ্জা,

যা আমি লোক চক্ষুর আড়াল থেকে লুকিয়ে রাখতে প্রাণপণ করি,—তাই ঢাক পিটিয়ে সকলের সাম্‌নে প্রচার করবে আর আমার সে অত্যন্ত নিভৃত গোপন ব্যথার স্থানে কারণে অকারণে আঘাত করবে নির্ম্মম ভাবে? এদিকে বয়েসের তুলনায় আমি একটু লম্বা ছিলাম। একদিন গ্রামারের কি ভুল বার হোতেই ফণিমাষ্টার বল্লে—নাঃ, এ ধাড়ী ছোঁড়াটাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখ্‌চি। বলি, গোঁপ দাড়ী যে লতিয়ে চললো, এখনও নাউনের পার্সিং শিখলে না? আমার চোখে লজ্জায়, অপমানে জল এল। আমার মনে হোল বাস্তবিকই আমার বয়েস বেশী, তাতে নীচের ক্লাসের ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে পড়া আমার পক্ষে লজ্জার কথা—প্রতিদিন ওদের চোখের সাম্‌নে আমি এরকমভাবে বকুনি খেতে আর পারিনে, বিশেষ করে ওই ছোট ছোট ছেলেরা—যারা আমায় দাদা বলে ডাকে, তাদের সাম্‌নেই আমার এ অপমানের লজ্জা অসহ্য।

বাড়ী গিয়ে মাকে লাজুক মুখে বল্লুম,—আমি আর ইস্কুলে পড়্‌বো না মা! আমার ক্লাসের ছেলেরা ছোট ছোট, আমার লজ্জা করে ওদের সঙ্গে পড়্‌তে—

মা অবাক্ হয়ে বল্লেন—কেনরে তোর বয়স কত হয়েচে?

—তুমিই বলনা কত হয়েচে?

—এই তেরোয় পড়্‌বি আষাঢ় মাসে—বারো বছর ন' মাস চল্‌চে—

—ও বয়সে কেউ বুঝি সিক্‌স্‌থ্‌ ক্লাসে পড়ে?

—না, তুমি একেবারে বুড়ো হয়ে গিয়েচ—তোমার দাঁত পড়ে গিয়েচে, চুল পেকে গিয়েচে—তুমি কি আর সিক্‌স্‌থ্‌ ক্লাসে পড়্‌তে পারো? পাগ্‌লা একটা কোথাকার—

মায়ের কথায় আমার মনের সন্দেহ দূর হোল না। নিজের ছেলেকে কেউ ছোট দেখে না—ওঁরাই আমায় ছোট বলেন, কই আর তো কেউ বলে না? হায় আমার সে তেরো বছর বয়েসের শৈশব! এখন সেই কথা ভাবি।

বয়েস আর কম্‌লো না—বেড়েই উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বাকী ক'বছরের মধ্যে আমার চেয়ে বড় কোনো ছেলে এসে ভর্ত্তি হোল না আমার ক্লাসে, আমিই সকলের 'দাদা' রয়ে গেলুম। এর পরে ক্লাসে আমি পড়াশুনোতে খুব ভাল হয়ে ফাষ্ট, সেকেণ্ড্‌ হয়ে উঠ্‌তাম—কিন্তু তাতে আমার গৌরব বাড়লো না। আমি সকলের চেয়ে বয়েসে বড়, আমি পড়াশুনোতে ভাল করবো, এতে বাহাদুরীটা কি?

এই সময় আবার আমার গোঁপ বেরুল একটু একটু—সেই dreaded গোঁপ, যার কথায় চিরকাল খোঁটা খেয়ে আস্‌চি—যখন সত্য সত্যই সেটা বেরুলো—তখন মরিয়া হয়ে সহ্য করলুম। প্রথম প্রথম বড় লজ্জা হোত—শেষে সয়ে গেল।

একবার আমাদের ওখানে রামেন্দুবাবু উকীলের বাড়ীতে তাঁর ভাগ্নে এল—তার নাম প্রসাদ, কল্‌কাতায় কলেজে বি, এ পড়ে। খুব ভাব হয়ে গেল তার সঙ্গে—হঠাৎ কথায় কথায় একদিন সে তার বয়েস বল্লে উনিশ বছর, আমি মনে হিসেব করে দেখলুম আমারও ওই বয়েস—অথচ আমি এবার মোটে ম্যাট্রিক দেবো—আর ও পড়ে বি, এ, থার্ড ইয়ার ক্লাসে। ক্লাসের সবাই ঠিক বলে, আমার বয়েস বেশী, আমি যে পড়াশুনোতে ভাল করবো, এ আর বিচিত্র কি?

ম্যাট্রিক দেবার সময়ে হেড্‌ মাষ্টারের কাছে ফর্ম্ম লিখ্‌বার সময় অন্য

সব ছেলে লিখলে ষোল, সতেরো। ধীরেন বলে একটা ছেলে ষোলর চেয়েও কম বলে তাকে হেড্ মাষ্টার পরীক্ষা দিতেই দিলেন না—আর আমি লজ্জায় মুখ নীচু করে, কান লাল করে বয়েসের জায়গায় লিখ্লুম—উনিশ বছর ক' মাস। এমন বিড়ম্বনাতেও মানুষে পড়ে?

এই সময় আমি আর এক দুর্ভাবনায় পড়ে গেলুম। অনেক দিন আগে আমার আট, ন' বছর বয়েসে আমার মামা এসেছিলেন আমাদের বাড়ীতে। তাঁর গোঁফ বেরিয়েছিল, খুব লম্বা চওড়া—তাঁকে আমার খুব বড় বলেই মনে হোত—আমি তাঁর বুকে হেলান দিয়ে বস্তাম সে সময়—আমাকে কাঁধে পিঠে করে নিয়েও কত খেলা করেচেন। তখন শুনেছিলাম মা'র মুখে যে মামার বয়েস বাইশ বছর! উঃ, সে কত বয়েস? তার ওদিকে তখন ভাব্তেই পারতুম না—আমার শৈশব মনের জগতের অনন্তকাল সমুদ্রে 'বাইশ বছর' বলে একটা পরিচিত, একটা সুদূর দ্বীপ ছিল—আমার বয়োবৃদ্ধ মামা ছিলেন সেই দ্বীপের অধিবাসী—তার ওদিকে কি আছে আমি জান্তাম না, ভাব্তেও চেষ্টা করিনি তখন; সেই থেকে বাইশ বছরের সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা ছিল—যে যা'র বয়েস বাইশ বছর, তার জীবন ফুরিয়ে এল।

এই ম্যাট্রিক দেবার বছরে আমার হঠাৎ মনে হোল, আমার বয়েস কুড়িতে পড়বার আর দেরী নেই—এবং সেই ভীষণ বাইশ বছরে আস্বার দেরী মাত্র দু'টী বছর! আরও মুস্কিল বাধ্ল এই যে—এতদিন ছিল গোঁপ, এইবার আমার এমন অবস্থাতে এসে পৌঁছুতে হোল যে দাড়ী না কামালে আর চলে না। গোঁপ ও দাড়ী দুই-ই হোল। গোঁপ-

দাড়ী এবং কুড়ি বছরে পা দেবার দেরী মাস কতক মোটে—তার পরে বছর দুই পরেই বাইশ বছর।

কিন্তু তখনকার দু' বছর অনেক সময়—আজকালকার মত নয়। মন ছিল চিন্তাশূন্য, স্ফূর্তিবাজ, কৌতুকপ্রিয়,—দুবছর আসতে দেরী হয়ে গেল। এল বাইশ বছর...চলেও গেল!

তখন যদি কেউ বলতোও যে আমার বয়েস কম, বাইশ বছর আর এমন কি বয়েস—তাহোলেও হয়তো তার কথা আমার বিশ্বাস হোত না, যেমন বারো বছর বয়েসে বিশ্বাস করিনি মায়ের কথা যে আমি ছোট—কিন্তু আসলে সে-কথা আমাকে কেউ বলেওনি।

বরং আরও একটা ঘটনায় তার উল্টো কথাটাই একবার শুনলুম। তেইশ বছর বয়েসে আমার বিবাহের জন্য কোথা থেকে একটা সম্বন্ধ এল—আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়চি। ঘটক আমাকে দেখে বল্লে- ছেলের বয়েস একটু বেশী না?

বাবা সামনে বসে। বল্লেন, কোথায়, এইতো মোটে তেইশ—

আমি ভাবলুম বেশতো? বাবা ওরকম কথা কেন বল্লেন? ছিঃ, ওরা কি মনে ভাবলে? মোটে তেইশ মানে কি? সেই থেকে আমার বিশ্বাস হোল যে বিবাহ করবারও আমার বয়েস আর নেই। ঘটক নিশ্চয় আমার লম্বা চওড়া মূর্তি দেখে আমার বয়স বেশী আন্দাজ করেছিল—তেইশ বছরের অনুপাতে আমার চেহারা বড় ছিল। কিন্তু আমার সেই থেকে বিশ্বাস দাঁড়ালো অন্যরকম।

চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ...

ত্রিশ বৎসর বয়সে যেদিন পড়লাম, সেদিন থেকে মনে হোল এখন থেকে গম্ভীরভাবে চলাফেরা করতে হবে, সাদারং ছাড়া অন্য রঙের জামা-পরা তো অনেকদিনই ছেড়েছিলুম, এখন থেকে ছোট বড় চুল ছাঁটা পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলুম। তখন থাকতুম পাড়াগাঁয়ে, সেখানে কেউ কোন দিন একথা বলেনি যে আমার বয়েস খুব বেশী এমন কিছু নয়। পাড়াগাঁয়ে কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, ত্রিশের পরেই বৃদ্ধত্বে পৌঁছোয়, মনে তো বটেই, চেহারাতেও খানিকটা বটে।

কারণ আমাদের মুখশ্রীকে আমরা অহঃরহ গড়্‌চি, আমাদের ভাব ও চিন্তার দ্বারা, যেমন ভাস্কর বাটালি দিয়ে মূর্ত্তির মুখ গড়ে। এদের প্রভাব আমাদের মুখশ্রীর ওপরে অনেক বেশী, অন্তরের তারুণ্য মুখশ্রীতে তো বটেই, সারাদেহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এমন কি দৈহিক স্বাস্থ্যের ওপরও। বাল্যের কত সুন্দর মুখ ছেলেকে যৌবনে হৃতশ্রী, হীনশ্রী হ'তে দেখেচি, শিক্ষার ও কাল্‌চারের অভাবে। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কত লোকেরও দেখেচি, বিধাতা যেন তাদের দেহ ও মুখশ্রীকে এমন কি চোখের দৃষ্টি পর্য্যন্ত ভেঙ্গে গড়েচেন।

এ সব অবান্তর কথা যাক্‌।

তারপর আজ এতকাল পরে যখন পঞ্চাশের কোঠায় বয়েস চল্‌চে, কাগজে পত্রে লোকের মুখে শুনি কুড়ি বছর বয়েস, থেকে তরুণ বয়েসের নাকি সুরু—মোটের ওপর বাইশ বছরটা যে নিতান্ত তরুণ বয়েস, এতকাল পরে তা' বুঝেচি খুব ভাল করেই। কারণ আমার বড় ছেলেরই প্রায় হ'তে চলেচে ওই।

কিন্তু শুন্‌লাম কখন, যখন আর বয়োবৃদ্ধ ভীষ্ম পিতামহ মর্ত্ত্যধামে

ফিরে এলেও আর আমাদের তরুণ বল্‌তে সাহস করবেন না, স্নেহপরবশ হয়েও নয়, লোকলজ্জার ভয় একটা আছে তো ?

হায়রে আমার বাইশ বৎসরের প্রথম যৌবন, তুমি যখন এসেছিলে, তখন তোমায় চিনিনি, তারপর পৃথিবী নিজের কক্ষপথে বহুদূরে চলে গিয়েচে সে দিনটির পরে, আজ আর তোমার জন্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে লাভ কি ? কিন্তু মুস্কিল এই যে তখন একথা বল্লেও বিশ্বাস করতুম না। একটা কথা মনে এল। চব্বিশ বছর বয়সে একবার টুর্গেনিভের কোন একখানা বইয়ে পড়ি যে ভালবাসা, প্রেম, রোমান্স সব তরুণদের জন্যে। যৌবন ফুরিয়ে গেলে ওসবের দিন শেষ হোল। কথাটা পড়ে মনে বড় কষ্ট হয়েছিল,—এই জন্যে যে আমার আর সেদিন নেই—বাইশ বছরের গণ্ডি অনেক দিন ছাড়িয়েচি, যৌবন কতকাল শেষ হয়ে গিয়েচে।

তাই বলচি যদি—কেউ একথা বলতো তখন যে আমার বাইশ বৎসরে তরুণ বয়েসের অবসান নয়, সবে সুরু—একথা আমি বিশ্বাস করতুম না নিশ্চয়।

মা তো বারো বছর বয়সে বলেছিলেন আমি ছেলে মানুষ, সেতো নিতান্ত বাল্যকাল, মায়ের কথা কি বিশ্বাস করেছিলাম ?

বৈদ্যনাথ

তিন দিন ধরিয়া কলিকাতায় বেজায় বর্ষা নামিয়াছে। এ ধরণের বর্ষা এ বছর পড়ে নাই। ছাতিতে জল আটকায় না কারণ সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াও তেমনি, রাস্তায় রাস্তায় জল বাধিয়া গিয়াছে। ট্রামে দিনের বেলা আলো জ্বালানো, দোকানে দোকানে সামনের দিকে তেরপল ফেলা, পথে ঘাটে লোকজনও খুব বেশী যে চলা-ফেরা করিতেছে এমন নয়।

আপিসে যাইতেছি, বেলা দশটা কি বড় জোর দশটা পনেরো। ট্রামে যাইতে পারিতাম কিন্তু এ বর্ষায় হাঁটিয়া যাইতে বড় ভাল লাগিতেছিল, ট্রাম লাইন পার হইয়া হাঁটা পথ ধরিলাম।

বৌবাজারের মোড়ে কে পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল—দাদা,—ও দাদা - দাদা শুনুন্—

আমাকেই ডাকিতেছে না কি? ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম। যে ডাকিতেছিল, সে কাছে আসিল। বছর পনেরো ষোল বয়স, পরণের কাপড় যৎপরোনাস্তি ময়লা, গায়ে চার-পাঁচ জায়গায় ছেঁড়া কোট, মাথার চুল রুক্ষ, ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া, খালি পা; রাঙা রাঙা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—চিন্‌তে পাচ্ছেন না দাদা, আমি বদ্দিনাথ।

ও! সেজ মামার ছেলে বোদে! এর বয়স যখন বছর দশেক তখন ইহাকে দেখিয়াছিলাম, তারপর বছর পাঁচ-ছয় আর দেখি নাই। কিন্তু না দেখিলেও ইহার বিষয় সব শুনিয়াছি। অতি বদ্ ছোকরা, দশ বছর বয়সে বাড়ী হইতে পলাইয়া হুগলীতে কোন্ যাত্রার দলে ঢোকে, বছর

খানেক খোঁজ খবর ছিল না, হঠাৎ রাজসাহী হইতে এক বেয়ারিং পত্র পাওয়া যায় যে, বদ্দিনাথ টাইফয়েডে মর-মর, শেষ দেখা করিতে হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া ইত্যাদি। সেজ মামার ছেলের উপর তত টান ছিল না। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া কায়েমী সংসার পাতাইয়াছেন—প্রথম পক্ষের অবাধ্য ছেলে বাঁচুক্ বা মরুক্, তাঁর পক্ষে সমান কথা। কিন্তু বদ্দিনাথের পিসি কাঁদা-কাটা সুরু করাতে তিনি দ্বিতীয় পক্ষের বড় শালাকে রাজসাহীতে পাঠাইয়া দেন! সে যাত্রা বদ্দিনাথ বাঁচিয়া উঠিল, চুল-ওঠা জার্ণ-শীর্ণ চেহারা লইয়া বাড়ীও ফিরিল কিন্তু মাস তিনেকের মধ্যেই আবার উধাও, আবার নিখোঁজ। এবারও আর এক যাত্রাদলে বছর খানেক ঘুরিয়া বোদে নগদ সতেরোটি টাকা হাতে করিয়া বাড়া আসিল ও সৎমায়ের কাছে টাকাটা জমা রাখিল। অত বড় ছেলে বাড়ী বসিয়া খায় ও দু' তিনদিন অন্তর সৎমায়ের কাছে পয়সা চাহিয়া লয়, আজ আট আনা, কাল তিন আনা, তারপর দিন এক টাকা। চুল ছাঁটিতে হইবে, শার্ট তৈরী করিতে দিতে হইবে, বন্ধু-বান্ধবে খাইতে চাহিয়াছে, নানা অজুহাত। আসলে জানা গেল যে, বিড়ি সিগারেটেই বদ্দিনাথের মাসে চারি-পাঁচ টাকা লাগে। তা ছাড়া চা, বাবুগিরি, সাবান, কলিকাতায় যাওয়া ইত্যাদি আছে। সে সতেরো টাকার মধ্যে টাকা দুই সংসারের সাহায্যে লাগিয়াছিল, বাকীটা বদ্দিনাথের ব্যক্তিগত সখের খরচ যোগাইতে ব্যয়িত হয়। সেজ মামার সংসারের অবস্থা খুব স্বচ্ছল নয়, দুই টাকায় যখন বদ্দিনাথ সাত মাস বসিয়া খাইল এবং নিজের টাকা ফুরাইলে জোর-জুলুম গাল-মন্দ করিয়া বিমাতার নিকট হইতে আরও দু'চার টাকা আদায় করিল—তখন সেজমামা স্পষ্ট

জানাইয়া দিলেন তাহাকে এরূপ ভাবে বসিয়া খাওয়াইতে তিনি পারিবেন না। বদ্দিনাথ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আরও সাত মাস বসিয়া সংসারের অন্নধ্বংস করিল, খুব নিশ্চিন্ত মনেই করিল—আরও কয়েক টাকা সৎমায়ের নিকটে আদায় করিল, বৈমাত্র ভাই-বোনের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ মার-ধোর করিল—শেষে সেজ মামার শ্বশুর বাড়ীর (শ্বশুর বাড়ীর গ্রামেই সেজ মামা ইদানীং বাস করিয়াছিলেন) কাহার পকেট হইতে টাকা চুরি করিয়া একদিন দুপুরে আহারাদির পরে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। সে আজ বছর দুই আগেকার কথা।

কিন্তু এ সকল কথাই আমি শুনিয়াছিলাম এক তরফা—বদ্দিনাথের শত্রুপক্ষের মুখে। অর্থাৎ তার সৎমা ও বাবার মুখে! বদ্দিনাথের স্বপক্ষেও হয়ত অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু সে কথা আমি শুনি নাই। বদ্দিনাথকে আজ এ অবস্থায় দেখিয়া মনে মনে তাহার উপর সহানুভূতি হইল—বলিলাম—ভিজচিস্ কেন? আয় ছাতির মধ্যে। তারপর এ অবস্থায় কোথা থেকে? শ্রীরামপুরে যাস্ নি আর?

শ্রীরামপুরেই সেজ মামার শ্বশুর বাড়ী।

বদ্দিনাথ রাঙা দাঁত বাহির করিয়া একগাল হাসিল।—না দাদা, সেখানে বাবা বাড়ী ঢুকতে দ্যায় না। বলে, টাকা রোজগার করবি নে তো বসে বসে তোকে খাওয়ায় কে? গেছ্লুম আষাঢ় মাসে। বাবা হুকুম দিয়ে দিলে আমার ভাত বন্ধ করে দিতে। রাত্তিরে ইস্কুল ঘরে শুয়ে থাক্তুম। বাবা দোকানে খাতা লিখতে বেরিয়ে গেলে মাকে গিয়ে বলতুম, ভাত দাও নৈলে কি আমি না খেয়ে মরবো না কি? মা চুপি চুপি খাইয়ে দিত। আবার এসে সারাদিন ইস্কুল ঘরে শুয়ে থাকতুম।

এ রকম কোরে ক'দিন কাটে ? সতোরই আষাঢ় বাড়ী থেকে বেরিয়েচি আবার।

বলিলাম এ ক'দিন ছিলি কোথায় ?

—গাড়ীতে গাড়ীতে বেড়াচ্চি। পরশু দিল্লী এক্সপ্রেসে বেনারস গেছ্‌লুম, আজ এই এলুম। পথে পথেই ঘুরুচি ক'দিন—আমার তো আর টিকিট লাগে না ? ধরবে কে ? এ গাড়ীতে চেকার এল, ও গাড়ীতে গিয়ে বসলুম। নিতান্ত ধরলে বল্লুম, গরীব ভিখিরী, পয়সা নেই। বল্লে নেমে যাও। নিতান্ত গালমন্দ দিলে তো নেমে গিয়ে পরের ট্রেণে আবার চড়লুম। গাড়ীর মধ্যে বসে থাক্‌লে তবু তো বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচি ?

বৃষ্টিটা আবার জোরে আসিল। দু'জনে একটা গাড়ী-বারান্দার নীচে দাঁড়াইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম তোর মামার বাড়ীতে যাস্ নে কেন, শুনিচি তাদের না কি বেশ অবস্থা ভালো ?

—ভালো তো, কিন্তু তারা আমায় দেখতে পারে না। সেবার বসিরহাটে আমাদের দলের গাওনা ছিল তো, ওখান থেকে মামার বাড়ী গেলুম। বড় মামা বল্লে—এখানে কি জন্যে এলি ? দিদিমা বল্লে—যাকে নিয়ে সম্বন্ধ, সে-ই যখন চলে গিয়েছে তখন তোর সঙ্গে আর সুবাদ কিসের ? তুই আর এখানে আসিস্ নে। সেই থেকে আর যাই নে।

একটা খাবারের দোকানে বসাইয়া বদ্দিনাথকে কিছু খাওয়াইলাম। সে যেরূপ গোগ্রাসে খাইতে লাগিল, তাহাতে বুঝিলাম কয়েকদিন তাহার অদৃষ্টে আহার জোটে নাই বোধ হয়।

ছোঁড়াটার নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ, এই বৃষ্টি-বর্ষায় ছেঁড়া কাপড় পরিয়া খালি পেটে আশ্রয় অভাবে আজ দিল্লী, কাল বেনারস করিয়া রেলে রেলে বেড়াইতেছে, দূর দূর করিয়া শেয়াল-কুকুরের মত সবাই তাড়াইয়া দিতেছে, এমন কি নিজের বাবা পর্য্যন্ত! বেচারি তবে যায় কোথায়? বলিলেই তো হইল না!

ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম—এক কাজ কর বোদে, তুই রাণাঘাটে আমার বাসায় গিয়ে থাক্। চল আমি তোকে টিকিট কেটে গাড়ীতে উঠিয়ে দিচ্ছি—সেখানে বাড়ীর ছেলের মতন থাকবি, কোন কষ্ট হবে না, চল্।

টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া বদ্দিনাথের হাতে আনা দুই পয়সা দিয়া বলিলাম—পথে যদি দরকার হয় রৈল তোর কাছে।

শনিবার রাণাঘাটে গিয়া দেখিলাম বদ্দিনাথ বাড়ীতে মেয়েদের কাছে খুব আদর-যত্ন পাইতেছে। কাপড়-জামা মেয়েরা সাবান দিয়া কাচিয়া দিয়াছে, বদ্দিনাথের চেহারারও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মাথার চুল দশ আনা ছ'আনা ছাঁটা, বেশ টেরী কাটা, পথের মোড়ে সাঁকোর উপর বিড়ি খাইতেছিল, আমায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিল।

দাদার ছোট মেয়ে পাঁচীর জন্য একখানা সাবান আনিয়াছিলাম, দুপুরের পরে সেখানা ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া তাহাকে দিতেছি, বদ্দিনাথ ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়া বলিল—ও সাবান কি করবে দাদা, দিন্ আমায় দিন্—দিন্ না?…

আমি একটু অবাক হইয়া গেলাম। ষোল-সতেরো বছরের ছেলে, নিতান্ত খোকাটি নয়—সাত-আট বছরের মেয়ে, সম্পর্কে তার ছোট বোন্ হয়—তার জিনিস কাড়িয়া লইতে যায়, আর বিশেষ করিয়া আমার হাত হইতে! পাঁচীকে বলিলাম—পাঁচী, এ সাবানখানা তোর দাদাকে দে—তোর জন্যে এখানকার বাজার থেকে আর একখানা আনিয়ে দেবো'খন। কেমন তো?

পাঁচী আমার কথার প্রতিবাদ করিল না। নীরবে কাঁদো কাঁদো মুখে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। সাবানখানা বদ্দিনাথ লোভ-লোলুপ ব্যগ্রতার সহিত আমার হাত হইতে একরূপ লুফিয়াই লইল। মনটা আমার কেমন অপ্রসন্ন হইয়া গেল।

দু'দিন পরে দেখিলাম বদ্দিনাথ বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের সকলকে শাসন করিতে সুরু করিয়াছে। কাহাকেও বলিতেছে হাড় ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিব, কাহাকেও বলিতেছে, পিঠে জলবিছুটি দিব ইত্যাদি। হয়তো কেউ খাবারের জন্য বাড়ীতে বিরক্ত করিতেছে, কেহ বা বলিতেছে সে আজ কিছুতেই চুল ছাঁটিবে না, কেহ বা তেতো ওষুধ খাইতে চাহিতেছে না, কিংবা হয়তো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়াছে—এই সব তাহাদের অপরাধ। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কেউ বকুনি মার-ধর করে—এ আমি একেবারেই পছন্দ করি না। বদ্দিনাথকে ডাকিয়া বলিয়াছিলাম ওদের কথায় তোর থাকবার দরকার কি রে বোদে? ওরা যা খুসি করুক্ না, তুই ওরকম করে বকিস্ নে ওদের।

মাঝে আর একবার রাণাঘাটে গেলাম। বদ্দিনাথকে বাড়ীতে না দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—বদ্দিনাথ কোথায় দেখ্‌চিনে যে?

শুনিলাম সে বাড়ীতে প্রায় থাকে না, দু'বেলা খাওয়ার সময় হাজির হয় মাত্র, ষ্টেশনের কাছে—কোন্ পাঁউরুটির দোকানে তার আড্ডা—সেখানে দিন-রাত বসিয়া ইয়ার্কি দেয়। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা তাহার নামে নানা অভিযোগ উত্থাপিত করিল। দাদার মেয়ে বলিল—আমার সে সাবানখানা বদ্দিনাথ কাকা কেড়ে নিয়েচে, বল্লে—যদি না দিস্ তবে তোকে মেরে চিংড়ি মাছ বানাবো।

সন্ধ্যার সময়ে মোহিত ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসিয়া চা খাইতেছি—বদ্দিনাথ আসিয়া বলিল—চার আনা পয়সা দিন্, বৌদি বলে দিলেন বাজার থেকে আলু নিয়ে যেতে হবে। বদ্দিনাথের উপর মনটা তত প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু পয়সা দিতে গিয়া মনে মনে ভাবিলাম—যাই হোক্, দুষ্টুমিই করুক্ আর যাই করুক, বাসার একটু আধটু সাহায্য তো ওকে দিয়ে হচ্চে।...বয়েস কম, দুষ্টুমি একটুআধটু করেই থাকে!

দু'তিন দিন পরে বৌদি, আবার কতকগুলি নূতন অভিযোগ বদ্দিনাথের বিরুদ্ধে যখন আনিলেন—তখন ওই কথাই আমি বলিলাম। বৌদি বলিলেন—কবে কোন্ কাজ করে ও? কে বলেছে তোমায় ঠাকুর-পো? শুধু খাওয়া আর পাউরুটির দোকানে না কোথায় বসে ইয়ার্কি দেওয়া, এ ছাড়া আর কি কাজ ওর?

বলিলাম—কেন, হাট-বাজার তো প্রায়ই করে। এই তো সেদিনও তুমিই ওকে বাজার কর্ত্তে দিয়েছিলে, আলু না কি—এর আগেও তো অনেকবার—

বৌদিদি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—আমি? কবে—কৈ আমার তো মনে হয় না, কে বল্লে?

আমি বলিলাম—বল্‌বে আবার কে? আচ্ছা দাঁড়াও, ভজিয়ে দিচ্ছি।

আমার মনেও কেমন সন্দেহ হইল। বদ্দিনাথকে ডাকাইলাম কিন্তু তাকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না। বৌদিদি বলিলেন, তিনি দিব্য করিতে প্রস্তুত আছেন যে, বদ্দিনাথকে কখনও কিছু কিনিয়া আনিতে তিনি দেন নাই। তখন মনে পড়িল বদ্দিনাথ এটা ওটা বাড়ীর ফরমাজের ছুতায় আমার নিকট হইতে দু'আনা চার আনা অনেকবার আদায় করিয়াছে, প্রায়ই যখন মোহিত ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারীতে বসিয়া আড্ডা দিই, সেই সময় গিয়া চায়—উঃ, ছোকরা কি ধড়িবাজ, ঠিকই বুঝিয়াছিল যে আমি যখন আড্ডায় মস্‌গুল, তখন পয়সা চাহিলেও আমি তাহার কাছে কোন কৈফিয়ৎ চাহিব না, কেন পয়সা, কিসের জন্য পয়সা—অথবা বাড়ীতেও সে বিষয়ের উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাইব।

ভাবিলাম, ছোঁড়াকে এমন শিক্ষা দিব যাহাতে ওপথে আর কখনো না যায়, কিন্তু সেদিন আমি আহারাদি করিয়া রাত্রের ট্রেণে যখন কলিকাতা রওনা হইলাম, তখনও পর্য্যন্ত বদ্দিনাথ বাড়ী ফেরে নাই।

পুনরায় বাড়ী আসিলাম মাসখানেক পরে।

বদ্দিনাথের কথা তখন নানা কাজে একরূপ চাপা পড়িয়া গিয়াছে—তাহার উপর রাগটাও পড়িয়া গিয়াছে। পূজার অল্পই দেরী, রাণাঘাটের বাজারেই প্রতি বছর কাপড় চোপড় কিনি, কে বহিয়া আনে কলিকাতা হইতে? হইল না হয় দু'এক পয়সা দর বেশী। বাড়ীর

ছেলে-মেয়ে সঙ্গে লইয়া কাপড়ের দোকানে গিয়া পছন্দসই জিনিস কিনিবার বেশ একটা আনন্দ আছে, কলিকাতা হইতে মোট বাঁধিয়া কাপড় কিনিয়া আনিলে সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। বদ্দিনাথ আর্জ্জি পেশ করিল তাহার কাপড় চাই, জুতা চাই, সার্ট চাই. গামছা চাই, একটা টিনের তোরঙ্গ চাই।

দেখিলাম অনেক টাকার খেলা। তোরঙ্গের কি দরকার এখন? থাক এখন, পূজার পর দেখা যাইবে। দু'জোড়া কাপড় কেন, এখন এক জোড়াই চলুক, একটা সার্টেই পূজা কাটিয়া যাইবে এখন। জুতা একেবারেই নাই? পায়ের মাপটা দিলে বরঞ্চ আস্‌চে শনিবার চীনে বাড়ী—

পূজার সপ্তমীর দিন একটা ঘটনা ঘটিল। বৈঠকখানায় বসিয়া দৈনন্দিন বাজার হিসাব লিখিতেছি, বাহির হইতে অপরিচিত চড়া গলায় কে বলিল—এইটে কি সামন্ত পাড়ার বিনোদ চৌধুরীর বাড়ী?

জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলাম—আমারই নাম। কি চাই?

মড়ুইপোড়া বামুনের মত চেহারা একটা পাকসিটে গড়নের লোক ঘরে প্রবেশ করিল। মাথার চুল কাঁচায় পাকায় মেশানো, আর লম্বা লম্বা, গায়ে আধ ময়লা গেঞ্জির ওপরে একটা চাদর। হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—ভালোই হলো, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রণাম হই চৌধুরী মশায়। কথাটা বল্‌তেই হয় শেষকালটা। আপনার ছোট ভাই সুরেন আমাদের দোকান থেকে—

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—আমার ছোট ভাই সুরেন?

—হ্যাঁ, ঐ যে লম্বা, একহারা কালোমত চেহারা, ছোক্‌রা ষোল-সতেরো বছর বয়স—

বুঝিতে বিলম্ব হইল না, লোকটা কাহার কথা বলিতেছে। বলিলাম হ্যাঁ, কি করেচে শুনি?

কি আর করবে, সর্ব্বনাশ করেছে মশাই। আমাদের ঐ ইষ্টিশানের মোড়ে রুটি-বিস্কুটের কারখানা আর দোকান—দেখেচেন বোধ হয়, বাবু তো ওইখান দিয়েই যান আসেন। আমার নাম রতন ঠাকুর, শ্রীরাম রতন বাঁড়ুয্যে। আজ্ঞে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়, কি করি, পেটের দায়ে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—তারপর কি হয়েচে বলছিলেন?

সে এক লম্বা গল্প করিয়া গেল। বদ্দিনাথ ওখানে বসিয়া আড্ডা দিত, আমার সহোদর ভাই এবং নাম সুরেন এই পরিচয় দিয়া সেখানে খুব খাতির জমাইয়াছিল। বলিত, দাদার সঙ্গে বনিতেছে না, শীঘ্রই সে না কি পৃথক হইবে। রাধাবল্লভতলায় একখানা বাড়ী আছে, তাহারই ভাগে পড়িবে সেখানা। তখন সে-ও রতন ঠাকুরের রুটি-বিস্কুটের ব্যবসায় যোগ দিবে, কিছু মূলধন ফেলিতেও রাজী আছে। রতন ঠাকুর তাহাকে বিশ্বাস করিয়া দোকানে বসাইয়া মাঝে মাঝে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে নিজের ভেণ্ডারদের কাছে যাইত—এরকম আজ মাস দুই চলিয়া আসিতেছে, রতন কোন অবিশ্বাস করিত না। ইদানীং রতন তাহারই উপর কেনা-বেচার ভার দিয়া হয়তো দু'পাঁচ ঘণ্টার জন্য দোকানে অনুপস্থিত থাকিত। গত কল্য রতন চাকদায় গিয়াছিল কি কাজে; বদ্দিনাথকে দোকানে বসাইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে ক্যাশ মিলাইতে গিয়া রতন দেখে

ছাব্বিশ টাকা তেরো আনা ক্যাশ বাক্স হইতে উধাও হইয়াছে। নিশ্চয়ই এ বদ্দিনাথ ছাড়া আর কাহারও কাজ নয়, হইতেই পারে না, তাই সে সকালেই ছুটিয়া আমার কাছে আসিয়াছে।

কোনো রকমে বুঝাইয়া ভরসা দিয়া রতন ঠাকুরকে বিদায় দিলাম। যখন আমার সহোদর ভাই বিশ্বাসে রতন ঠাকুর তাহাকে প্রশ্রয় দিয়াছে, তখন সে আমার যেই হোক্—টাকা মারা যাইবে না রতনের। না হয় আমি নিজেই দিব।

বদ্দিনাথকে রতনের সামনে ডাকানো আমি উচিত বিবেচনা করিলাম না। ঘরের ভিতর তর্কাতর্কি কথা কাটাকাটি আমি পছন্দ করি না।

রতন চলিয়া গেলে বদ্দিনাথকে ডাকাইয়া বলিলাম—আমার এখানে থাকা তোমার পোয়াবে না বদ্দিনাথ, তুমি অন্য জায়গা দেখে নাও।

বিকালে বদ্দিনাথ পোটলা-পুটলি লইয়া বিদায় হইল। এর পরে বদ্দিনাথকে দেখি নাই আর অনেক দিন।

মাস পাঁচ ছয় পরে ট্রেণে কলিকাতা হইতে ফিরিতেছি, বারাকপুরের প্ল্যাটফর্ম্মে হঠাৎ দেখি অতি মলিন এক কাচা গলায় বদ্দিনাথ। ব্যাপার কি? সেজ মামা ও মামীমা দিব্য সুস্থ দেহে বর্ত্তমান আছেন, গত শনিবারেও দেখা করিয়া আসিলাম, তবে বদ্দিনাথের গলায় কাচা কিসের? ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই বদ্দিনাথ আমার গাড়ীর দরজাতে আসিয়া পৌছিল এবং ইনাইয়া বিনাইয়া যাত্রীদের কাছে বলিতে লাগিল যে, সম্প্রতি তার মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছে, তাহার আর কেহ নাই, কি করিয়া মাতৃদায় হইতে উদ্ধার হইবে ভাবিয়া ভাবিয়া রাত্রে ঘুম হয় না, অতএব—ইত্যাদি

আমি দেখিলাম, আমার কামরায় আসিল বলিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি সে কামরা হইতে নামিয়া অন্য একখানা গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। কি বিপদ! কি বিপদ! এমন বিপদেও মানুষে পড়ে!

একদিন বড় মামার বাসায় গিয়া গল্পটা করিলাম। বড় মামা বলিলেন—ওর কথা আর বোলো না। মধ্যে কি মাসটা এখানে তো এল। তোমার মামীমা বল্লেন, বোদে তুই তো এলি—তোর পকেটে তো একটা পয়সাও নেই দেখ্‌ছি—আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে রে। বোদে বল্লে, আমারও ভয় হচ্ছে জ্যাঠাইমা, টুনুর গলার হার, ছোট খুকীর বালা সাম্‌লে রাখো। তোমার মামীমা তখ্‌খুনি তাদের হার বালা সব খুলে ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরলে। খুব সকালে বদ্দিনাথ চলে গেল আমি তখনও মশারীর মধ্যে শুয়ে। একটু বেলা হোলে দেখি, আমার বাঁধানো হুঁকোটা ঘরের কোণে নেই। খোঁজ্‌ খোঁজ্‌, আর খোঁজ্‌!......কার কীর্ত্তি বুঝ্‌তে বাকী রইল না। সেই থেকে আর তাকে দেখি নি। ছোক্‌রাটা এমন করে উচ্ছন্ন গেল! ওর বাবারও দোষ নেই। ওকে মানুষ করবার চেষ্টা যথেষ্ট করেছিল কিন্তু যে মানুষ না হবার, তাকে মানুষ করে কার সাধ্যি? পূজোর পরে সেজ মামার পত্রে জানিলাম, দত্তপুকুরের জমিদার কাছারী হইতে একখানা পুরানো কাপড় চুরি করিবার ফলে বদ্দিনাথের জেল হইয়াছে তিন মাস। জেল হইতে বাহির হইবার অনেক দিন পরে সে একবার রাণাঘাটে আমার বাসায় আসিল। সবারই মুখে শুনিতে পাইলাম বদ্দিনাথ ভালো হইয়া গিয়াছে, কি করিয়া তাহারা এ কথা জানিল, আমি তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু হঠাৎ দেখি বদ্দিনাথকে বাড়ীর সবাই খুব যত্ন আদর করিতেছে। দিন দুই তিন বাসায় থাকিল,

একদিন সকালে বদ্দিনাথ চা খাইতে খাইতে আমারই সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে, বৌদিদি আসিয়া বলিলেন,—বোদে, এই বাটি রইলো আর ঠাকুরপোর কাছ থেকে দশটা পয়সা নিয়ে ওই মোড়ের দোকান থেকে সর্ষের তেল নিয়ে আসিস্ তো! বদ্দিনাথকে পয়সা বাহির করিয়া দিলাম চা খাওয়ার পরে। বদ্দিনাথ কাঁসার বাটিটা হাতে করিয়া পয়সা ট্যাঁকে গুঁজিয়া বাহির হইয়া গেল। সকাল সাড়ে সাতটার বেশী নয়।

বদ্দিনাথের সঙ্গে পুনরায় দেখা বছরখানেক পরে, হঠাৎ একদিন কলিকাতায়, 'সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের মধ্যে একটা গলির মোড়ে। জীর্ণ, মলিন, ছন্নছাড়া মূর্ত্তি—খালি পা, বড় বড় ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল, যেমন ময়লা কাপড় পরণে, ততোধিক ময়লা জামা গায়ে।

প্রথম কথাই আমার মুখ দিয়া কি জানি বাহির হইয়া গেল, হ্যাঁরে, বোদে, বাটিটা কি করলি রে?—

এই একবৎসর যেন ওই কথাটা জানিবার জন্যই হাঁ করিয়াছিলাম। বদ্দিনাথ বিপন্নমুখে কি একটা জবাব দিবার দু'একবার চেষ্টা করিতে গিয়া যেন বিষম খাইল এবং হঠাৎ সুড়ুৎ করিয়া পাশের গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

———

ডানপিটে

যে সময়ে আমাদের গল্পের স্বরু, কাশীতে তখন উৎকৃষ্ট লাচ্ছাদার রাবড়ি পাঁচ আনা সের বিক্রয় হইত, ল্যাংড়া আম টাকায় এক পণ, মহিষের দুধ টাকায় পাকি বারো সের।

বাংলা ১২৮৭-৮৮ সালের কথা।

কাশীতে তখন স্কুল-কলেজ বেশী ছিল না, সহরের বসতি আরও ঘিঞ্জি ছিল, তেলের আলো জ্বলিত রাস্তায়, অত্যন্ত অপরিষ্কার ছিল সহরের অবস্থা, গাড়ী-ঘোড়া ছিল কম। বুড়ুয়া মঙ্গলের মেলার সময় গঙ্গার ধারে ধনীদের দু'চারখানা নতুন ধরণের ভিক্টোরিয়া কি ফিটন দেখা যাইত। এক্কা ও স্প্রিং-বিহীন টাঙা ছিল প্রধান সম্বল, সহরের বাহিরে উটের গাড়ী চলিত।

গণেশ-মহল্লাতে তখন রামজীবন চক্রবর্ত্তীর খুব নাম ও পসার-প্রতিপত্তি। কমিসারিয়েট বিভাগে বড় চাকুরিতে তিনি বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন, তবে হাতে রাখিতে পারিতেন না। সেকালের রীতি অনুযায়ী তাঁর কাশীর বাড়ীটা ছিল একটা হোটেলখানা। চাকুরি-প্রয়াসী বা অক্ষম ও নিরাশ্রয় আত্মীয়-স্বজন ও স্ব গ্রামের লোকের ভিড়ে বাড়িতে পা দিবার স্থান থাকিত না।

রামজীবনবাবুর চার ছেলে, বড় তিনটি ভয়ানক ডানপিটে, স্কুলে যাবার নাম করিয়া পথে মারামারি করিত, ঘুড়ি উড়াইত, স্কুলের সময়টি কাটাইয়া ছুটির সময়ে বাড়ি ফিরিত। ইহাদের উপযুক্ত সঙ্গীও জুটিয়াছিল দশ-বারোজন পাড়ার ছেলে, সকলেই সমান ডানপিটে, সমানই তাদের

বিদ্যার্জ্জন-স্পৃহা। স্কুলের সময় দল বাঁধিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া হয়তো সহরের বাহিরে পথের ধারের এক বড় পেয়ারা বাগানে ঢুকিয়া ফল ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়া বেলা চারটার পরে বাড়ি ফিরিত। কোনোদিন বা সারনাথের পথে কোথাও চড়ুইভাতি করিতে গেল। মাসের মধ্যে পনেরোদিন এই রকম চলিত।

গণেশ মহল্লাতে প্রেমচাঁদ মুখুয্যে নামে নদীয়া জেলার একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাশীবাস করিতেন। তাঁর এক পিতৃমাতৃহীন ভাই-পো তাঁর কাছে থাকিয়া নামে বিদ্যাভ্যাস করিত। কাজে সে ছিল উপরোক্ত ডানপিটে স্কুল-পালানো ছেলের দলের একজন চাঁই সদস্য। ভ্রাতুষ্পুত্রটির নাম সতীশ, রং টকটকে গৌরবর্ণ, একহারা চেহারা, নতুন স্প্রিং-এর মত তার সমস্ত দেহের একটা দৃঢ়তা, বাঁধুনী ও স্থিতিস্থাপকতা ছিল। নতুন নতুন বদমায়সি ফন্দী আঁটিবার বুদ্ধিতে ও সাহসে দলের সকলেই তার কাছে হার মানিত।

ফলে এই দলটির লেখাপড়া যাহা হইবার হইল, তারপর যখন সখের থিয়েটারের ধূম কলিকাতা হইতে কাশী গিয়া পৌছিল, এদের দল কাশীতে নব আন্দালনের প্রতিভূ ও প্রাণ-স্বরূপ হইয়া মহা উৎসাহে নিজেরাই বড় বড় কাগজে সিন্ আঁকিয়া বেলের আঠা দিয়া জুড়িতে লাগিল। নিজেরাই ষ্টেজ বাঁধিল এবং ঘণ্টা-মার্কা সবেদার সাহায্যে রাজা, উজির সাজিয়া নাটকাভিনয় সুরু করিল।

বছর পাঁচেক পরে প্রেমচাঁদ মুখুয্যের লীলা-প্রাপ্তি ঘটিল, গণেশ মহল্লার রামজীবনবাবুও গবর্ণমেণ্ট পেন্সনের মায়া কাটাইলেন। তাঁর ছেলেরা পৈতৃক অর্থ ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়া ভায়ে ভায়ে পৃথক হইল। সতীশ নিরাশ্রয় ও কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় এখানে-ওখানে ঘুরিতে ঘুরিতে জুটিল গিয়া নেপালে।

নেপালে যে কি করিয়া সে দরবার হাঁসপাতালে কম্পাউণ্ডারী পাইয়া চাকুরিতে ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে দু'পয়সা রোজগার করিতে লাগিল, যে সতীশ ইংরাজি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর গণ্ডি তিন বৎসরেও ডিঙাইতে পারে নাই, সে কি করিয়া দুরূহ ইংরাজীতে লেখা ডাক্তারী বই আয়ত্ত করিয়াছিল সামান্য বেতনের কম্পাউণ্ডার হইয়া সে কি ভাবে অবসর সময়ে রোগী দেখিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে বেশ নাম করিয়া ফেলিয়াছিল—সে সব খবর দিতে পারিব না। কিন্তু প্রাকৃটিসে সে বাস্তবিকই সুনাম অর্জ্জন করিল বিশেষ করিয়া অস্ত্র চিকিৎসায়। ভালো ও নিপুণ অস্ত্রচিকিৎসকের যে যে গুণ থাকা দরকার—সাফ্ হাত, সাফ্ চোখ, সাহস, সতর্কতা, প্রকৃতিস্থতা, অবিচলিত বিচার-বুদ্ধি—এ সবগুণ তার ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে পসারও।

সতীশ নেপালে আসিয়া স্থানীয় স্কুলের জনৈক শিক্ষকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। শিক্ষকের নাম মৃত্যুঞ্জয়বাবু, বাড়ী নদীয়া জেলা মেহেরপুরে। পাঁচ বৎসর অন্তর বৃদ্ধ পিতাকে দেখিতে একবার করিয়া দেশে যাইতেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে বাংলা ১৩০৭ সালে তাঁহাদেরই সঙ্গে সতীশ বাংলাদেশে অনেককাল পরে ফিরিয়া আসিল ও সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা সহর দেখিল। পৈতৃক বাসস্থান যে গ্রামে ছিল, সেখানেও একবার গেল। বাংলাদেশে আসিয়া সতীশের মনে হইল যে, মায়ের মুখ সে ভাল মনে করিতে পারে না, ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট সামান্য একটু মনে পড়ে, যেন মেঘলা দিনের দিবানিদ্রার স্বপ্ন—সে মায়ের স্নেহ সারা দেশটাতে ছড়াইয়া পড়িয়া যেন সাগ্রহে তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। গ্রামে আসিলে গ্রামের তো কেহ তাহাকে চিনিতেই

পারে না, কারণ সে গিয়াছিল নিতান্ত ছেলেবেলাতে দশ-বারো বছর বয়সে। পৈতৃক ভিটা খুঁজিয়া বাহির করিতে বেগ পাইতে হইল, কারণ এমন দুর্ভেদ্য বন-জঙ্গলে ঢাকিয়া পড়িয়াছে যে বাহির হইতে চিনিয়া লওয়াই কষ্টকর।

গ্রামের সকলেই আসিয়া ধরিয়া বসিল যে, তাহাকে দেশে ঘরবাড়ী করিতে হইবে—এখানে বাস করিতে হইবে। ইহার মধ্যে প্রতিবেশীর পুত্রের উপর নিছক নিঃস্বার্থ ভালবাসা ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশে মোটে ডাক্তার নাই, সতীশের মত একজন নামজাদা ডাক্তার গ্রামে বসিয়া প্রাক্‌টিস্ করিলে গ্রামের লোকের সুবিধা বড় কম নহে—চক্ষুলজ্জার খাতিরে অন্ততঃ গ্রামের লোকের কাছে সে তো আর ভিজিট লইতে পারিবে না?

সেবার সতীশ ভিটার মায়া কাটাইয়া ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু দেশের মায়া তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল—পরের বৎসরই সে পুনরায় শীতকালে ছুটী লইয়া গ্রামে ফিরিয়া পৈতৃক ভিটার বনজঙ্গল কাটাইয়া সেখানে টিনের ঘর তুলিয়া ফেলিল। ছুটি ফুরাইলে আবার কর্ম্মস্থানে ফিরিল সেবারও।

কিন্তু দেশের মায়া একবার পাইয়া বসিলে তাকে কি ছাড়ানো সহজ? চন্দ্রগিরি, উদয়গিরির দুর্গম গিরিসঙ্কট পার হইয়াও নদীয়া জেলার ক্ষুদ্র গ্রামের ডাক নেপালে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। পর বৎসর সতীশ চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া স্ত্রী-পুত্রসহ দেশে আসিয়া বসিল ও গ্রামে প্রাক্‌টিস্ সুরু করিল।

সে আজ বত্রিশ বছর পূর্ব্বের কথা। তখন অলিতে-গলিতে এম্‌-বি, পাশ ডাক্তার হয় নাই, আজ কালকারের মত পাশ-করা ডাক্তার খুঁজিয়া

মেলানো দুর্ঘট ছিল। নিস্তুট্রবৃর্ত্তী নরহরিহরপুরের বাজারে তখন যাদুরাম স্যাকরা ছিল দেশের মধ্যে বড় ডাক্তার।

যাদুরাম বাদে একজন মুসলমান হোমিওপ্যাথ, একজন কবিরাজও ছিল। ইহারা গেল প্রবীণের দলে। তরুণের মধ্যে কানাইলাল রায় কলিকাতা হইতে কিসের একখানা সর্টিফিকেট্ আনিয়া ডাক্তার সাজিয়া বসিয়াছিল।

সতীশ আসিয়াই প্র্যাক্‌টিস্ জমাইয়া ফেলিল। সে উপরোক্ত হাতুড়েদলের অনুকরণে নরহরিপুরের বাজারে ডাক্তারখানা খুলিল না, আধহাত লম্বা হরফে নিজের নামের সাইনবোর্ড ঝুলাইল না, বা রোগীর বাড়া আসিয়া স্থানীয় অন্যান্য ডাক্তারদের নিন্দাবাদ করাও অভ্যাস করিল না। গ্রামের বাড়ার একখানা ঘরে ঔষধ রাখিত, আলাদা ডিস্‌পেন্‌সারিও ছিল না—রোগীরা আসিয়া বসিত সতীশের বাড়ার সামনে বটতলায়, তাহাদের বসিবার স্থানের পর্য্যন্ত কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও সতীশের বাড়ীর সামনের বটতলায় রোগীর ভিড় দিন দিন বাড়িয়া চলিল। দিনেরাতে স্নানাহারের সময় নাই, সাত-আট ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতেও রোগী দেখিবার ডাক আসিতেছে, গরুর গাড়াতে রোগী দেখিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সতীশ হাঁফাইয়া পড়িল। প্রতিদিন সকালে নিজের বাড়ীতে গড়ে তিন-চারটা সার্জ্জিক্যাল কেস লাগিয়াই আছে।

ব্যাপার দেখিয়া যাদুরাম একদিন কানাই ডাক্তারকে ডাকিয়া বলিল, "এত রুগী এ-দেশে ছিল কোথায় এতদিন হে?" গত বিশ বৎসরের মধ্যে যাদু ডাক্তার এত রোগীর ভিড় কখনো দেখে নাই এ-অঞ্চলে।

বেগতিক বুঝিয়া কবিরাজটি একদিন জিনিসপত্র বাঁধিয়া অন্যত্র সরিয়া পড়িল—কানাই দরজির দোকান খুলিবার জন্য সুবিধামত দোকান ঘরের সন্ধান করিতে লাগিল। যাদু স্যাক্‌রার অন্য কোনো উপায় ছিল না এ-বয়সে। আগেকার দু'পাঁচটা বাঁধা পুরানো ঘর ও পূর্ব্ব-সঞ্চিত সামান্য কিছু টাকার জোরে কোনো রকমে টিকিয়া রহিল মাত্র।

সতীশের দু'টি ছেলে ও ছোট একটি মেয়ে। মেয়েটীর হঠাৎ একদিন ভয়ানক জ্বর হইয়া পড়িল। নিজের বাড়ীতে নিজে চিকিৎসা করা যায় না বলিয়া সতীশ যাদুরাম স্যাক্‌রাকে ডাকাইল। যাদুরাম দেখিয়াই বিষন্নমুখে বলিল, তাই তো মুখুয্যে ম'শায়, এ তো ভয়ানক রোগ, আপনিও বোঝেন, আমিও বুঝি, এ-রোগ তো এখানে সারবার নয়। এখন অন্য সবাইকে তফাৎ করুন, ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়, ডিপ্‌থিরিয়া বড় সাংঘাতিক ব্যাপার কিনা?

যাদুরাম প্রাণপণে ক'দিন দেখিল, কিছুই করা গেল না। তৃতীয় দিনে মেয়েটি মারা পড়িল।

এই ব্যাপারের পর হইতে সতীশের স্ত্রীর সামান্য মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিল—আপন মনে বকুনি, ইহাই দাঁড়াইল উপসর্গ। নয় তো অন্য সবদিকে কোনো অপ্রকৃতিস্থতার চিহ্নও নাই, সংসারের কাজ-কর্ম্ম, স্বামী পুত্রের যত্ন—কিছুরই মধ্যে কোন ত্রুটি নাই।

সতীশ বড় দমিয়া গেল। হাতে পয়সার জোর ছিল, কিছুদিন প্র্যাক্‌টিস্ বন্ধ রাখিয়া এখানে-ওখানে ঘুরাইয়া আনিল সকলকে, পূর্ব্ববঙ্গে

শ্বশুরবাড়ী গিয়া রহিল কিছুদিন, কলিকাতায় আসিয়া ডাক্তার-কবিরাজ দেখাইল, তখনকার মত উপশম না হইল যে, এমন নয়। কিন্তু দেশে আসিয়াই 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং।'

বড় ছেলেটির বয়স বারো, সে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী রামনগরের হাই স্কুলের বোর্ডিং-এ থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছিল। ছোট ছেলেটিকেও এবার সতীশ সেখানে রাখিয়া দিল।

এ-সব বাংলা ১৩১২ সালের কথা।

তারপর যেমন অন্য পাঁচজন মানুষের দিন যায়, সতীশের দিনও তেমন ভাবে যাইতে লাগিল।

রোগী দেখা, টাকা রোজগার, সংসার প্রতিপালন।

ছেলেরা বড় হইল। বড় ছেলেটির নাম বিনয়, সে আই-এস্-সি পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িতে লাগিল। সতীশ পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য এই সময় তাহার বিবাহও দিল। ছোট ছেলে তখনও স্কুলের ছাত্র, সে তার দাদার চেয়েও মেধাবী এবং সুবুদ্ধি। ইতিমধ্যে নানাস্থান হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ যাতায়াত করিতেছিল।

এ সব গেল বাহিরের ব্যাপার। সতীশের মনের বড় অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল ধীরে ধীরে। পনেরো-যোল বৎসর ধরিয়া সে এই গ্রামে এবং পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে ডাক্তারী করিতেছে—এই পনেরো যোল বৎসরের জীবন নিতান্ত একঘেয়ে—রোগী দেখা, খাওয়া, ঘুমানো—ভূষণ দাঁ-এর দোকানে বসিয়া মাঝে মাঝে গল্প গুজব, সংসারের বাজার হাট করানোর ব্যবস্থা করা—দিনের পরদিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর একঘেয়ে, এক রকম জীবন ধারা, বৈচিত্র্য নাই, পরিবর্ত্তন নাই, নতুনতর

অনুভূতির কোনো আসিবার পথ নাই কোনো দিক্ দিয়া। কিন্তু সতীশ এ বিষয়ে খুব সচেতন নয়, জীবনে তেমন আর আনন্দ নাই, এ কথা এক আধবার তাহার মনে যে 'না উঠিয়াছে এমন নয়—কিন্তু এ লইয়া ভাবিতে সে বসে নাই কখনো, ভাবিবার সময়ও পায় নাই।

কিন্তু ক্রমে এ কথাটা তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল। হয়তো নিস্তব্ধ দুপুরে বিলের পাশের পথ দিয়া গরুর গাড়াতে আরামে সে ভিন্ গাঁয়ে রোগী দেখিতে চলিয়াছে। মাঠের ধারে ধারে ঘুঘু পাখীর ডাকে কিম্বা বিলের গভীর জলে বাগ্‌দী ছেলেকে ডোঙা চড়িয়া মাছ ধরিবার দৃশ্যে —সে দেখিত সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া কাশীতে যাপিত বাল্যজীবনের কথা ভাবিতেছে...রাম রাম সাহু হালুইকরের দোকানে লছমী বলিয়া সেই মেয়েটী থাকিত—এতকাল পরেও তার সে গলার সুমিষ্ট সুর যেন প্রাণে লাগিয়া আছে...একবার সে, রামজীবনবাবুর বড় ছেলে বাদল, তাঁর ভাগ্নে নরু—তিনজনে জঙ্গম বাড়ীর বারোয়ারী আসরে সিদ্ধি খাইয়া কি কাণ্ডটাই করিয়াছিল।...

নেপালে একবার কর্ণেল খড়গ সম্সের জঙ্গ রাণা বাহাদুরের কন্যার বিবাহেতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিল। গিয়া দেখিল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নাই—একটা মোড়কের মধ্যে মসলা ও সুপারি আর একটা মোড়কে পাঁচটী টাকা। সতীশ কর্ণেল বাহাদুরের দেওয়ানকে বলিল— টাকা কিসের? নিমন্ত্রিত হয়ে এসে টাকা নেওয়া আমরা অপমানজনক মনে করি। দেওয়ান বলিল—এখানে এই নিয়ম। না নিলে কর্ণেল চটতে পারেন।

সতীশ রাগ করিয়া বলিল—চ'টে আমার কি করবেন তিনি? চাকরি

নেবেন ? নিন—আমি এখুনি ইস্তফা দিতে রাজি আছি, টাকা কখনই নিতে পারবো না।

গোলমাল শুনিয়া রাণা বাহাদুর নিজে আসিয়া ব্যাপারটা অন্যভাবে মিটাইয়া দিলেন। চাকুরি তো যাওয়া দূরের কথা, সেই মাসেই সতীশের দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল।...

গত পনেরো বৎসর ধরিয়া সতীশ তো অনবরত সকলের কাছেই কাশী আর নেপালের গল্প করিয়া আসিতেছে। তাহার সমবয়সী লোকেদের কাছে, দেশের বন্ধুদের কাছে, রোগী ও রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে—কিন্তু সে শুধু বাহাদুরী লইবার জন্য, সে কত দেশ বেড়াইয়া কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, কত বড়মানুষী করিয়াছে, কত বড় বড় লোকের সমাজে মিশিয়াছে—তাহা সাড়ম্বরে জারি করিবার জন্য। এবার কিন্তু সে সব জীবনের স্মৃতি একটা অস্পষ্ট বেদনার মত তাহার মনে আসিয়া উদয় হইতে লাগিল—কি যেন একটা জিনিস চিরকালের জন্য হারাইয়া গিয়াছে, আর কোনো দিন তাহার সাক্ষাৎ মিলিবে না, সতীশের এই এত বড় পসারের বিনিময়েও না, সঞ্চিত অর্থের বিনিময়েও না, কোনো কিছুতেই না।

এ গ্রামের জীবনও ক্রমে নিরানন্দ হইয়া উঠিতে লাগিল। সতীশ গ্রামে আসিয়া এ গ্রামে যে কয়টী সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী প্রবীণ আত্মীয় স্থানীয় লোক পাইয়াছিল, এ পাড়ায় অম্বিকা রায়, শ্যামাকান্ত গাঙ্গুলী—ও পাড়ার বৃদ্ধ গোঁসাই মশায়—এঁরা একে একে মারা গেলেন।

আষাঢ় মাসের শেষে যাদুরাম স্যাকরার রোগ শয্যা পার্শ্বে সতীশের ডাক পড়িল।

যাদুরামের বয়স হইয়াছিল প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের কাছাকাছি; গত দশ

বৎসর অর্থাভাব ও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যাদুরামের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সতীশ বুঝিল এই বয়সে, তার উপর ডবল নিউমোনিয়া রোগ, যাদুরামও বিছানা ছাড়িয়া আর উঠিবে না। যাদু রামও নিজে সেটা খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল—ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, মুখুয্যে মশায়, ওষুধ আর কি দেবেন, পায়ের ধূলো দিন। একটা কথা বলি, নাতিটার উপায় করতে পারলাম না, দুই দুইটা ছেলে মারা গেল—ওই টুকু বংশের মধ্যে শিবরাত্রির সল্‌তে, ওকে আপনার চরণে দিয়ে গেলাম। কম্পাউণ্ডারীতে ভর্তি ক'রে নেবেন আপনার ডাক্তারখানায়—বছর তিনেক দেখে শুনে শিখলে তবুও অন্য চাষা গাঁয়ে গিয়ে হাতুড়েগিরি করেও দুটো খেতে পারবে।

সতীশের চোখ জলে ভরিয়া আসিল ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ চিকিৎসকের অন্তিম শয্যাপার্শ্বে বসিয়া। সে আশ্বাস দিল, এ বিষয়ে তাহার দ্বারা যতদূর সাধ্য সে করিতে ত্রুটী করিবে না। যাদুরাম এমন পয়সা রাখিয়া যায় নাই, যাহাতে তাহার শ্রাদ্ধের খরচ নির্ব্বাহ হইতে পারে—সতীশ নিজে শ্রাদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিল। নাতিকে নিজের ডাক্তারখানায় আনিয়া কাজ শিখাইতে লাগিল, খুচরা কিছু দেনা ছিল বৃদ্ধের, তাহারও একরূপ সাময়িক মীমাংসা করিয়া দিল।

এই সময় সতীশের নিজের সময়েরও পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ছোট ছেলের কলেজের খরচ, বড়ছেলের ডাক্তারি পড়ার খরচ—এদিকে কি জানি কেন রোগীর সংখ্যা কমিতেছে। স্থানটা কি হঠাৎ স্বাস্থ্যনিবাস হইয়া উঠিল না-কি? সঞ্চিত অর্থে ক্রমশঃ হাত পড়িতে লাগিল—এবং সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, একবার সঞ্চিত অর্থে হাত যখন পড়িল, সে

হাতকে আর গুটানো গেল না—বৎসরের পর বৎসর ক্রমশঃ খরচ বাড়িয়াই চলিয়াছে—আয় তেমন নাই, হাতের টাকা নিঃশেষ হইতে এ অবস্থায় কত দিন লাগে ?

সতীশ অমানুষিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। আর দুটো বছর বিনয় মানুষ হইলে আর কিসের ভাবনা ? এ অঞ্চলে এম্ বি পাশ করা ডাক্তার ক'টা আছে ? কখনো যে সব গ্রামে দশ টাকা ভিজিটের কমে সতীশ যায় নাই—এখন চার টাকা লইয়াও সেখানে যাইতে হইতেছে। নিজে দুধ খাওয়া ছাড়িয়া দিল—বাড়ীর চাকরকে জবাব দিল। খরচ কম পড়িবে বলিয়া স্ত্রী ও পুত্রবধুকে কলিকাতায় পাঠাইয়া ছেলেদের বাসা করিয়া দিল—নিজে দেশে হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়া খাইয়া এবং সারাদিন টো টো করিয়া গ্রামে গ্রামে রোগী দেখিয়া যাহা পায়, প্রতি সপ্তাহে কলিকাতার বাসাতে বিনয়ের নামে মণিঅর্ডার করে।

বিনয় এম্ বি পাশ করিয়া যুদ্ধে গেল।

সতীশের দুঃখ ঘুচিল এতদিনে।

গ্রামের মধ্যেও একটা সাড়া পড়িল না এমন নয়। এ অঞ্চলে এম্-বি পাশ করা ডাক্তার এই প্রথম। তাহার উপর বিনয় আবার গবর্ণমেণ্টের চাকুরি পাইয়া সুদূর মেসোপোটেমিয়ায় গিয়াছে। সেদিন না-কি ছোট খাটো একটী খণ্ড যুদ্ধে আরবদের গুলী বিনয়ের কাণের পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, পয়সা কি এমনি হয় ? বিনয় পত্রে এ ঘটনাটি বাবাকে জানাইয়াছিল। নরহরিপুরের বাজারে ভূষণ দাঁ-এর পুরানো

আড্ডাটী আর ছিল না—কারণ পনেরো বৎসর হইল ভূষণ মরিয়া গিয়াছে তবুও এ দোকানে, ও দোকানে বসিয়া সতীশ গর্ব্বের সঙ্গে পুত্রের চিঠি হইতে যতটুকু সে দেশের খবর পায়, তারই সাহায্যে যুদ্ধের গল্প করে।

সঙ্গে সঙ্গে বলে—কিন্তু আমাদের নেপালে যখন প্রাইমিনিষ্টারের বাড়ীর সামনের ময়দানে প্যারেড হোত, তাতে আমরা যুদ্ধের কৌশল সবই দেখেচি। মেসিন্ গান? ও তো আমাদের সময়েই প্রথমে নেপালে এল...আমাদের কাছে ও সব নতুন নয়—

অর্থাৎ নেপাল ও সতীশের যৌবন—ইহারা কাহারও কাছে পরাজয় স্বীকার করিবে না। সব ছিল নেপালে। দু' চারবার মোটা টাকার মণিঅর্ডার পাইয়া সতীশ মহা উৎসাহে বাড়ী নতুন করিয়া তৈরী করিবার জন্য মিস্ত্রি লাগাইল। ছেলে বড় ডাক্তার হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, সাহেবী মেজাজ এখন তার—এ ধরণের বে-মেরামতি পুরাণ বাড়ীতে থাকিতে তাহার কষ্ট হইবে। সতীশ ছেলের উপযুক্ত মত বাড়ীর পুনরায় সংস্কার করিতে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া ফেলিল। এইখানে ডাক্তারখানা হইবে, এইটী ছেলের বসিবার ঘর, এইটী নাতিদের পড়িবার ঘর।

হঠাৎ মেসোপোটেমিয়া হইতে বিনয়ের পত্র আশা বন্ধ হইয়া গেল। দু'দশদিন করিয়া মাসখানেক কোনো খবর নাই—সতীশ অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল, সে নিজে অটল থাকিয়া স্ত্রী ও পুত্র-বধূকে নানা মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে, ক্রমে গ্রামময় গুজব রটিয়া গেল বিনয় আর নাই, যুদ্ধে মারা পড়িয়াছে।

বিনয়কে গ্রামের সকলেই ভালবাসিত, তাহার সুন্দর চেহারা ও মধুর ব্যবহারের গুণে বিনয়কে কেহ পর ভাবিত না। এ দুঃসংবাদে চোখের জল

ফেলিল না, এমন লোক নাই গ্রামে। সতীশের সহ্য করিবার শক্তি দেখিয়া সকলে অবাক্‌ হইয়া গেল, তাহার মুখে একদিন কেহ কোনো দুর্ব্বল কথা শুনিল না—চোখে জল দেখা তো দূরের কথা।

জ্যৈষ্ঠ মাস। ভীষণ গরম। মুখুয্যে বাড়ির তেঁতুল-তলার সামনে একখানা ভাঙা গরুর গাড়ির উপর বসিয়া পাড়ার নিষ্কর্ম্মা যুবকেরা আড্ডা দিতেছে—এমন সময়ে সাইকেলে মোড়ের মাথায় সাহেবী-পোষাকে কাহাকে আসিতে দেখা গেল। বিনয়!...

মুখুয্যে গিন্নী স্নানান্তে শিব-পূজা করিতে বসিয়াছিলেন, পূজা ফেলিয়া ছুটিতে ছুটিতে পথের ধারে আসিলেন অর্থাৎ তাঁহার পায়ের বাতের দরুণ যতটুকু ছোটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় ততটুকু বেগে বিনয়কে বুকের মধ্যে জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, যুবকেরা সকলে বলিল, আচ্ছা ভয় দেখিয়েছিলেন বিনয়-দা, বেশ যা হোক্—

বিদ্যুৎবেগে গ্রামের সর্ব্বত্র বিনয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সতীশ ডাক্তারের বাড়ির উঠানে সব পাড়ার লোক ভাঙিয়া পড়িল। বিভিন্ন পাড়ায় সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামের মেয়েরা হরিলুট দিল।

বিনয় যুদ্ধ হইতে আসিয়া প্রথম প্রথম গ্রামেই বসিয়াছিল—তারপরে সে মহকুমায় গিয়া বসিয়াছে। এত পসার এ অঞ্চলে কোনো ডাক্তারের কেহ কখনো দেখে নাই।

সতীশও ডাক্তারী করিত স্ব-গ্রামেই কিন্তু ছেলে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে

তাহার পসার কমিয়া গেল, সবাই বিনয়কে চায়, সতীশকে কেহ বড় একটা ডাকে না। সে সকলকে গর্ব্বের সঙ্গে বলে, তা তো হবেই, বিনয় এসেচেন। অত বড় ডাক্তার, আমরা তো সেকেলে কোয়াক্, ওঁদের কাছে কি আমরা—

পরাজয়েরও সুখ আছে, গর্ব্ব আছে।

সতীশ একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, সে বৃদ্ধের দলে পড়িয়া গিয়াছে। গণেশ মহল্লার সে ডান্‌পিটে সতীশ—ঠাসা বন্দুকের এক ছ্যাওড়ে অসিঘাটের ও-পারের চরে যে তিনটা পাখী মারিয়াছিল মনে আছে, বুড়ুয়া মঙ্গলের সময় আলোকিত বজরার পাশ দিয়া ডুব সাঁতার দিতে দিতে কাহাদের আলোকোজ্জ্বল বজ্‌রা—

যাক্, সে সব পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটিয়া লাভ কি? মোটের উপর সতীশকে সবাই এখন 'বুড়োকর্ত্তা' বলিতে সুরু করিয়াছে এটা সে লক্ষ্য করিল; বিশেষতঃ বিনয় ফিরিয়া আসিবার পর হইতে।

নাতিরা স্কুলে পড়ে। সতীশের ছোট ছেলে কিন্তু ভাল হইল না। সে কলেজ ছাড়িয়া দিয়া এতদিন বাড়িতেই বসিয়াছিল—এইবার দাদার ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারী আরম্ভ করিল।

জলের স্রোতের মত বৎসর কাটিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে বিনয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের পর সাত বৎসর কাটিল।

এই সাত বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল সতীশের জগতে। বিনয় কুসঙ্গে পড়িয়া ঘোর মাতাল হইয়া উঠিয়াছে—পয়সা যথেষ্ট রোজগার করে কিন্তু হাতে রাখিতে পারে না। কাহাকেও মানে না। যুদ্ধে গিয়াই সে মদ খাইতে শিখিয়াছিল। আগে বাপকে ভয় করিত, লোক-লজ্জার ভয় রাখিত। এখন বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাপকে আর তেমন মানে না।

সতীশ স্ব-গ্রামেই থাকিত। প্রথম প্রথম পুত্র-বধূরা গ্রামের বাড়িতেই থাকিত। ক্রমে তাহারা চলিয়া গেল বিনয়ের বাসায়। সতীশের স্ত্রীর সেই উন্মাদ রোগ একেবারে কখনো সারে নাই, এই সময় বেশী করিয়া দেখা দিল। সেই জন্যই মাকে বিনয় দেশের বাড়িতে রাখিয়াছিল। কিন্তু এতদিন সর্ব্বদা দেখাশুনা করিত শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ত্রুটি কখনো করে নাই।

ক্রমে ক্রমে কিন্তু মাকেও সে অবহেলা করিতে লাগিল। একমাসেও একবার মাকে দেখিতে আসে না, অথচ সে মোটর কিনিয়াছে। এই ন' মাইল পথ আসিতে কতক্ষণ লাগে?

শুধু পানদোষ নয়, আনুষঙ্গিক অনেক উপসর্গই জুটিয়াছে বিনয়ের। স্ত্রী-পুত্রকেও যন্ত্রণা দেয়, সংসারের ন্যায্য খরচের টাকা রাত্রে কোথায় গিয়া ব্যয় করিয়া আসে, কেহ জানে না। প্রায়ই সারারাত্রি বাহিরে কাটায়। মাঝে মাঝে দিনমানেও ডাক্তারখানায় বসে না। পসার কমিতে লাগিল, রোগীরা আসিয়া ফিরিয়া যায়। বৃদ্ধ বয়সে সতীশ ঘোর অর্থকষ্টে পড়িল। বিনয় বাপ-মাকে মাঝে মাঝে টাকা যে না দেয় এমন নয়, কিন্তু তাহাতে সতীশের চলে না। ছোট ছেলেটী দাদার অবস্থা দেখিয়া নিজের স্ত্রী পুত্র লইয়া শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল, সে-ও বাপ-মায়ের বিশেষ কোনো সংবাদ লয় না।

সন্ধ্যা বেলা বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সতীশ অন্যমনস্ক ভাবে এই সব কথাই ভাবিতেছিল, এমন সময়ে উঠানে কাহাকে আসিতে দেখা গেল।...

—কে?

...আমি পটল, দাদা।

সতীশ খুসি হইয়া একগাল হাসিয়া হুঁকা-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

...আয়, পটল! আয়, আয়,—

পটল বিনয়ের বড় ছেলে দিব্যেন্দুর ডাক নাম। গৌরবর্ণ, সুশ্রী, চোদ্দ-পনেরো বছরের হাস্যমুখ বালক। নাতিদের জন্য বৃদ্ধের মন কেমন করে সর্ব্বদা—কিন্তু তাহারা বড় একটা এদিকে পা দেয় না। অপ্রত্যাশিত-ভাবে নাতিকে আসিতে দেখিয়া সতীশ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল।

—তোর বাবার খবর কিরে, পটল?

দিব্যেন্দু অপরাধীর মত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—সেই একই রকম, দাদা। বরং আরও বেড়েচে। পরে সে দাগ দেখাইল, মাতাল অবস্থায় বাবা কি একটা শক্ত এ্যালজেব্রার অঙ্ক কসিতে, দিয়াছিল, সে পারে নাই বলিয়া ছড়ি দিয়া মারিয়াছে। দু'জনে বসিয়া অনেক কথা হইল। সতীশ বলিল—বোস্ পটল, রাঁধি গে গিয়ে, খাবি কি নৈলে?

সতীশের স্ত্রী এখন সম্পূর্ণ পাগল, এক ঘরে একা দিন রাত শুইয়া থাকে, আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকে, কাজকর্ম্ম করা দূরের কথা, না খাওয়াইয়া দিলে খায় না। সতীশ বলিল—এক একবার মনে হয় পটল, আবার প্র্যাক্‌টিস সুরু করি। কিন্তু এখন আর কেউ আমায় ডাক্‌বে না। ত্রিশ বছর আগে যখন এসেছিলাম এ দেশে, তখন তেমন ডাক্তার ছিল না। এখন নরহরিপুরের বাজারেই তিনটে ক্যাম্বেল পাশ, একটা এম্ বি। ও দিকে তো বিনয় রয়েচে, অমল রয়েচে, শ্যামবাবু—সবাই এম্ বি। আমাকে আর কে ডাক্‌বে?

দিব্যেন্দু বলে—ভেবো না দাদা। আমি পাশ করে যখন চাকরী করবো, তখন তোমার আর এ দশা থাকবে না।

সতীশ উৎসাহের সহিত বলে—আমায় কাশী পাঠিয়ে দিস্, পটল। কতকাল দেখিনি—এই শুন্‌বি তবে আমরা কি করতাম সেখানে?

দিব্যেন্দু জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত কাশীর গল্প, নেপালের গল্প অনেক শুনিয়াছে ঠাকুর দাদার মুখে। একই গল্প পঞ্চাশবার সে শুনিয়াছে অন্ততঃ। মুখস্থ বলিতে পারে। তবুও বৃদ্ধ ঠাকুরদাদাকে খুসি করিবার জন্য বলিল—বল না, দাদা! চন্দ্রগিরি পার হবার সময় সেবার নেপালের পথে সেই কি হয়েছিল?

দিব্যেন্দু কখনো নেপাল দেখে নাই, কিন্তু ঠাকুরদাদার মুখে আজন্ম বর্ণনা শুনিয়া চন্দ্রগিরি, রত্নগিরি, রক্সৌলের পশুপতিনাথ-মেলার দৃশ্য—এসব তাহার মানসপটে সুস্পষ্ট রেখা ও বর্ণে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। চোখ বুজিলেই এ সব যেন সে দেখিতে পায়।

সকালে উঠিয়া দিব্যেন্দু চলিয়া গেল!

সতীশ বলিল—তোর বাবাকে বলিস্ দিকি পটল, জুতো এই ত্যাখ্, একেবারে নেই—স্যাণ্ডেলটা সেই তোর বাবার দরুণ, সেবার বাসা থেকে এনেছিলাম, তা ছিঁড়ে গিয়েচে।

দিব্যেন্দু যাবার সময় বলিয়া গেল—এ-সব কথা আমি বলেচি, বোলো না যেন বাবাকে, দাদা। তা হোলে বাবা পিঠের ছাল তুল্‌বে আমার—

দিব্যেন্দু চলিয়া গেলে বৃদ্ধ আবার পুরাতন দিনগুলির স্বপ্ন দেখিতে থাকে। আজকাল হাতে কাজকর্ম্ম একেবারেই নাই—এ ধরণের অলস

জীবন সে যাপন করে নাই কখনো—আপন মনে বসিলেই সেই সব কথাই মনে আসে।

গাঙুলী বাড়ীর আন্নাকালী দুটী কচি শসা হাতে পৈঠাতে উঠিয়া বলিল —গাছে হয়েছিল জ্যাঠাবাবু, মা ব'ললে দিয়ে আয়।

আঁচলের মুড়োয় বাঁধা কি একটা জিনিস খুলিতে খুলিতে বলিল—আর এই ক'টা—

সতীশের মনের নিরানন্দভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। আগ্রহ উজ্জ্বল চোখে আন্নাকালীর আঁচলে বাঁধা দ্রব্যের দিকে চাহিয়া বলিল—কি রে ওতে? মটর ডালের বড়ি! বাঃ বাঃ—দে, রাখ্ এখানে, মা।

সতীশ চিরকাল খাইতে ও খাওয়াইতে ভালবাসে। আজকাল অভাবে পড়িয়া গিয়াছে, অমন উপার্জ্জন-ক্ষম ছেলে থাকিতেও নাই—তাই গ্রামের মেয়েরা ভাল জিনিসটা বাড়ীতে হইলে সতীশকে মাঝে মাঝে পাঠাইয়া দেয়।

আন্নাকালী চোদ্দ-পনোরো বছরের সুন্দরী মেয়ে—উপরি উপরি চারটী কন্যার জন্মগ্রহণের পরে বাপ-মা পঞ্চম ও সর্ব্বকনিষ্ঠ কন্যাটীর ওই নাম রাখিয়াছিল, নামের সঙ্গে তার চেহারার কোনো সম্পর্ক নাই। সে হাসিয়া বলিল—আপনার হাতের সেই কলায়ের ডাল রান্না কখনো ভুলবো না জ্যাঠাবাবু। মেয়ে মানুষে অমন রাঁধতে পারে না।

সতীশ, খুসী হইয়া উজ্জ্বল মুখে বলিল—কবে খেলি রে, আন্না?

আন্নাকালী ঘাড় দুলাইয়া বলিল—বা রে, এই তো ভাদ্রমাসে আরান্ধর দিন? তারপর ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল—জ্যাঠাইমা কেমন?

—ওই এক রকম, ওর আবার ভালো আর মন্দ। ওরই জন্যে তো

কোথায় যেতে পারি নে আন্না। নইলে কাশীতে গেলে একটা পেট চলে যায়। আর কাশীময় আমার বন্ধু-বান্ধব—তা ওর অযত্ন হবে, ওকে দেখ্‌বে শুন্‌বে কে, সেই জন্যেই তো আছি আট্‌কে। নইলে আমার আবার ভাবনা? এই শুন্‌বি, কাশীতে আমরা কি করতাম?

তারপর কাশীর গল্প আরম্ভ হয়। আন্নাও এসব গল্প ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছে, কিন্তু গল্প শুনিতে সে ভালবাসে. বিশেষ করিয়া জ্যাঠামহাশয়ের মুখে। সে রোয়াকের পৈঠার উপর বসিয়া পড়ে। কাশীর কথা হইতে হইতে কখন নেপালের কথা আসিয়া পড়িয়াছে দু'জনের কেহই লক্ষ্য করে নাই, হঠাৎ আন্না উঠানের দিকে ভীত চোখে চাহিয়া বলিল—জ্যাঠাইমা কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে যে!…

—ধর্‌, ধর্‌, মা, ধর্‌—নিয়ে আয়। নাঃ, জ্বালালে বাপু।

আন্না দৌড়িয়া উঠিয়া গিয়া শীর্ণদেহ, রুক্ষকেশ, বকুনি-রত জ্যাঠাইমার হাতখানা খপ্‌ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—এসো জ্যাঠাইমা, কোথায় যাচ্চ, এসো…

—একেবারে ঘরের মধ্যে নিয়ে যা, মা। নাঃ, আমার হয়েচে যতো বিপদ; তা ইয়ে আন্না, কলায়ের ডাল রাঁধবো এখন মা, আজ দুপুরে আমার এখানে দুটো খাস্‌ এখন।

পরের বছর হইতে বিনয়ের পসার একেবারেই কমিয়া গেল। দশ-বারো বছর আগের ব্যাপার আর ছিল না, এখন এক মহকুমার টাউনের উপর তিনজন এম্‌-বি। পানদোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ভদ্র-গৃহস্থের

বাড়ীতে তাহাকে কেহ আজকাল ডাকে না, তা ছাড়া রোগীরা আসিয়াও ডাক্তারের দেখা পায় না।

তাহার পর দেখা দিল পৃথিবী-ব্যাপী মন্দা। পাটের বাজার একেবারে পড়িয়া গেল। রোগ হইলেও আর লোকে ডাক্তার দেখাইতে পারে না। বিনয় মহা অর্থ-কষ্টের মধ্যে পড়িল। সে লোক খারাপ নয়, হাতে পয়সা থাকিলে যতক্ষণ খরচ করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার মনে শান্তি হয় না, উদার দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। বাবাকে সে ইচ্ছা করিয়া যে অবহেলা করে তা' নয়, বাবা এত ঘনিষ্ঠ, এত সুপরিচিত যে, তাহার সম্বন্ধে সে কোনো খেয়ালই করে না। সতীশ মুখ ফুটিয়া কখনো ছেলেকে জানায়ও নাই তাহার অসচ্ছলতার কথা, পাছে ছেলেকে বিব্রত হইতে হয়।

এই অবস্থায় একদিন বিনয় পিতার সহিত দেখা করিতে আসিল। সতীশ অপ্রত্যাশিত ভাবে ছেলেকে দেখিয়া মহাব্যস্ত হইয়া উঠিল। সারা বাড়ীর মধ্যে একখানা চেয়ার কি টুল পর্য্যন্ত নাই, ছেলেকে বসিতে দেয় কিসে যে!

বিনয় বলিল—থাক্ বাবা, থাক্, আমি এই যে বেশ বসেছি।

সতীশ ব্যস্তস্বরে বলিল...উঃ, ঘেমে একেবারে...দাঁড়াও একটু চা করে আনি। ভাড়াটে মোটরে এলে কেন? তোমার গাড়ী কোথায়?

—গাড়ী আছে, ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে মেরামতের জন্য একমুঠো টাকা দরকার, হাতে পয়সা কোথায়? কাজেই গাড়ী গ্যারেজে পড়ে।

—পটল কোথায়?

—কল্‌কাতাতেই আছে। ওর পড়াশুনার যে কি করি? মেসে তো একগাদা টাকা খরচ, তিন মাসের মেসের দেনা বাকী। কলেজের মাইনেও দু'মাস পাঠাতে পারিনি।

পিতা-পুত্রে অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল। তিন জায়গায় খরচ বিনয় তো আর চালাইতে পারে না। দেশের বাড়ী, টাউনের বাসা এবং দিব্যেন্দুর মেস ও কলেজের খরচ। কি এখন করা যায়!

বিশেষ কিছুরই মীমাংসা হইল না। উঠিবার সময় বিনয় কুণ্ঠিত ভাবে বাবাকে দু'টী টাকা দিতে গেল। ছেলের শুষ্ক ও চিন্তাকুল মুখ দেখিয়া বৃদ্ধ টাকা দু'টী প্রাণ ধরিয়া লইতে পারিল না। বলিল—রেখে দাও এখন, সোমবার দত্তিঘাটা থেকে ডাক এসেছিল কিছু পেয়েচি, তোমার মোটরের ভাড়াও তো লাগ্‌বে আবার?

গ্রামের একটী ছেলে রেলে কাজ করিত ছুটী লইয়া দেশে আসিয়া প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা সতীশের কাছে গল্প করিতে আসিত। একদিন সতীশ বলিল—দ্যাখো উমাপদ, ভাবৃচি কি জানো? তোমার জ্যাঠাইমাকে ওর বাপের বাড়ীতে রেখে আমি কাশী চ'লে যাই। একজন লোকের কাশীতে বেশ চ'ল্‌বে। নইলে এদিকে সবই তো শুন্‌লে—বিনয় বড় মুস্কিলে পড়েচে রুগী-পত্তর নেই, ডাক নেই এই বাজারে দু'টো সংসার চালানো কি সোজা কথা রে, বাবা? আমরা চ'লে গেলে, ও তবু খানিকটা খোলসা হয়.... তা ছাড়া কাশীতে আমার বন্ধু-বান্ধব ভর্ত্তি, আহা, কত কাণ্ডই করেচি সব এক সময়, কাশীতে কাকে না চিনি?

উমাপদ আবাল্য এ সব গল্পের সঙ্গে পরিচিত, সে বলিল—পাগল হয়েচেন? আপনার ছেলেবেলার আমলের তারা কি আর কেউ এখন আছে ভাবচেন? সে সব কি—

সতীশ কথাটা পছন্দ করিল না, বাধা দিয়া বলিল—তুমি কি ক'রে জানলে নেই? আমাদের সে ডানপিটে দলের ছেলে হঠাৎ মরবার নয় জেনো ('ছেলে' কথাটা অসতর্ক মুহূর্ত্তে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল)—সব আছে হেঁ-হেঁ হঠাৎ আমরা মরচি নে। তুমি জানো না, আমাদের সে দলের কথা শুনবে তবে?

উমাপদ ব্যস্ত হইয়া বলিল—ইয়ে, জ্যাঠামশায় আর একদিন বরং এসে—আজ একটু কাজ আছে—উঠি এখন।

দিন পনেরো পরে সতীশ একদিন কাশী ষ্টেশনে দুপুর বেলা নামিল। স্ত্রীকে মেহেরপুরে ছোট শালার কাছে রাখিয়া আসিয়াছে। আসিবার সময় বাড়ার চাবিটা আন্নাকালীর হাতে দিয়া আসিয়াছে, বিনয় আসিলে দিবার জন্য। ছেলেকে কোন খবর দেয় নাই—কেন মিছামিছি তাহাকে বিব্রত করা?

কাশীতে নামিয়া সতীশ মনে একটা অপূর্ব্ব উৎসাহ ও উত্তেজনা অনুভব করিল—বাল্যের সেই কাশী! এত দিন কি করিয়া ভুলিয়াছিল সে! বাংলা দেশের একটা জঙ্গলে-ভরা ছোট্ট পাড়া-গাঁয়ে জীবনের ত্রিশটী বছর—

সারাদিন ধরিয়া সে কাশীর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। পঞ্চগঙ্গা ঘাটে স্নান করিল, বিশ্বনাথ দর্শন করিল। বাল্যের দিনগুলির সঙ্গে জড়িত যে সব জায়গায় একদিনের মধ্যে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভব, তাহা সে বড় বাদ দিল না।

কিন্তু ধীরে ধীরে তাহার মনে হইতে লাগিল—কাশী, তাহার সে চল্লিশ

বছর আগেকার কাশীকে সে যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না, সে কাশী কোথায় গেল ? এ কাশীকে তো সে চেনে না।

গণেশ-মহল্লায় পুরাতন সঙ্গীদের সন্ধান কেহ জানে না, কেবল রামজীবন-বাবুর মেজোছেলে পতিতপাবন পৈতৃক বাটীতে এখনও বাস করিতেছে। পতিতপাবন সতীশকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। বলিল, সতীশ-দা, তোমার চেহারা তো এখনো বেশ আছে! আমারও ধরো এই বাষট্টি হোল, আমি তোমার চেয়ে বুড়ো হয়ে গেছি – মানে, অম্বলের অসুখে আমার— এতদিন ছিলে কোথায় ?

নানা পুরাতন দিনের গল্প হইল। পতিতপাবনের অবস্থা ভাল নয়, ব্যবসায় বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছিল। তারপর উপরি উপরি দু'টি উপযুক্ত ছেলে মারা গিয়াছে। ছোট ছেলেটি রেশমের কাপড়ের ব্যবসা করে বিশ্বনাথের গলির মধ্যে—তাতেই কোনোরকমে চলে। ভাইগুলির মধ্যে কেবল ছোট ভাইটি বাঁচিয়া আছে, পাটনাতে শ্বশুর-বাড়ী বাসা বাঁধিয়াছিল, বহুদিন হইল সেখানেই আছে।

সন্ধ্যাবেলা সতীশ দশাশ্বমেধ ঘাটে চুপ করিয়া বসিল। সম্মুখের হাসিমাখা, কত অজানা তরুণমুখ—গান...আনন্দের উচ্ছ্বাস...দিব্যেন্দুর কথা মনে পড়িল। দিব্যেন্দু বলিয়াছিল—দাদা, আমি চাকুরি করলে তোমার ভাবনা থাকবে না। দিব্যেন্দু জানে না যে, তাহার দাদা লুকাইয়া কাশী চলিয়া আসিয়াছে। এই দশাশ্বমেধ ঘাটে, এই সন্ধ্যাবেলা যেন প্রত্যেক বালককেই মনে হইতে লাগিল দিব্যেন্দু। দিব্যেন্দু না সে পঞ্চান্ন বছর আগেকার নিজে ?

আন্নাকালীর মুখ মনে পড়িল—যখন গরুর গাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়া

ঘরের চাবিটা তার হাতে দিয়াছিল, সে সময়কার তার ছলছল চোখ দু'টি মনে পড়িল।

নাঃ, সে ডানপিটে সে আর নাই। কাশীও তার কাছে আর কিছুই না। তার সে কাশী হারাইয়া গিয়াছে।

রাত্রে ঘুম হইল না কত রাত পর্য্যন্ত। শুইয়া শুইয়া ঠিক করিল সে ফিরিয়া যাইবে। আন্নাকালীর জন্য কাশীর কৌটা লইতে হইবে, ছেলেমানুষ, খুসি হইবে এখন। দিব্যেন্দুর জামার উপযুক্ত খানিকটা সিল্ক, পতিত-পাবনের কাছে ধারে লইয়া গেলেই হইবে, গিয়া দাম পাঠাইবে। ভাল পট...বৌমা ছবি ভালবাসে।

কিন্তু সকালে উঠিয়াই সে পতিতপাবনকে বলিল...তুমি একটা উপকার করো ভাই আমার। তোমার এখানে আর ক'দিন থাকবো? তুমি একটা বাজার সরকারী গোছের কাজ জুটিয়ে দাও দিকি আমায়। অভাবে রাঁধুনি গিরিতেও রাজি আছি। খুব ভাল রাঁধতে পারি, দেখে নেবে তারা।

নাঃ, সে ছেলেকে বিব্রত করিতে ফিরিবে না। ছেলে পারিয়া উঠিবে কেন? শেষে কি দিব্যেন্দুর কলেজের পড়া বন্ধ হইবে? বৌমার গহনা বন্ধক দিতে হইবে, ছিঃ—

একটা পেটের জন্য কাশীতে আবার ভাবনা?

যাত্রাবদল

ভাটপাড়াতে পিসিমার বাড়ী গিয়েছিলুম বড়দিনের ছুটীতে। সারাদিন বাড়ীতে বসে থেকে ভাল লাগ্‌ল না, বিকেলের দিকে নৈহাটী ষ্টেশনে বেড়াতে গেলুম। তখন দেশেই থাকি বিদেশে বেরুনো অভ্যেস নেই, এত বড় ষ্টেশন ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখবার সুযোগ বড় একটা হয়নি। ডাউন প্ল্যাটফর্ম্মের ওধারে প্রকাণ্ড ইয়ার্ডটা মালের ওয়াগনে ভর্ত্তি, ওভার ব্রিজের ওপর দিয়ে যাত্রীরা পোঁট্‌লাপুঁটলি নিয়ে যাতায়াত করচে, নানা ধরণের লোকের ভিড়, নানা রকমের শব্দ—দুখানা পাইলট এঞ্জিন ইয়ার্ডের মধ্যে ওয়াগণের সারি টানাটানিতে ব্যস্ত· ওপারের গাড়ী একখানা ছেড়ে গেল, আর একখানা এখুনি আস্‌বে...বাজারের দিকে সাইডিং লাইনে দুখানা কেরোসিন তেলের ট্যাঙ্ক বসানো গাড়ী থেকে তেল নামাচ্চে।··· এত মাছিও প্ল্যাটফর্ম্মে, কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াবার যো নেই, বসবার যো নেই, যেখানে যাই সেখানেই মাছি ভন্ ভন্ করে। চা খাওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ষ্টলের অবস্থা দেখে সেখানে বসে কিছু খেতে প্রবৃত্তি হোল না। প্ল্যাটফর্ম্মের ওধারে একটা ছোট ঘর, দোর বন্ধ, ঘরটার আশে পাশে পুরোণো শ্লিপার ও ফিশ-প্লেট্ পড়ে আছে রাশীকৃত, একটী ক্ষুদ্র কুলী-পরিবার সেখানে তের্‌পলের তাঁবু খাটিয়ে তোলা উনুনে আঁচ দিয়েচে।

হঠাৎ প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সবাই যেন প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের ধারে ঝুঁকে কলকাতার দিকে চেয়ে কি দেখবার চেষ্টা কর্ত্তে লাগল—একজন হিন্দুস্থানী যাত্রী প্ল্যাটফর্ম্মের নিতান্ত ধারে দাঁড়িয়ে চোখ

মুছতে ব্যস্ত—ওপার থেকে একজন কুলী তাকে হেঁকে বল্লে—এ আঁখ্ পুছনেওয়ালা, হঠ যাইয়ে, ডাকগাড়ী আতা হ্যায়—

কাছের একটি ভদ্রলোক যাত্রীকে জিগ্যেস্ কল্লুম—কোন্ ডাকগাড়ী মশাই ?…

তিনি বল্লেন—দার্জ্জিলিং মেলের সময় হয়েচে

একটু পরেই ধুলো কুটো উড়িয়ে একটা ছোটো খাটো ঘূর্ণী ঝড়ের সৃষ্টি করে ষ্টেশন কাঁপিয়ে দার্জ্জিলিং মেল বেরিয়ে গেল এবং সে শব্দ থাম্‌তে না থাম্‌তে ডাউন প্ল্যাটফর্ম্মে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ সশব্দে এসে দাঁড়ালো।

একটু পরে দেখি যে প্ল্যাটফর্ম্মে একটা গোলযোগ উঠেচে। অনেক লোক ওভার ব্রিজের ওপর দিয়ে ডাউন প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে ছুটে যাচ্চে—সবাই যেন কি বল্‌চে—ট্রেনটা ছাড়তেও খানিকটা দেরী হোল। তারপরে ট্রেনখানা ছেড়ে গেলে দেখলুম প্ল্যাটফর্ম্মের এক জায়গায় অনেক লোকের ভিড়, গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই কি যেন দেখচে।

ভিড় ঠেলে ঢুক্‌তে না পেরে একজনকে জিগ্যেস কর্ত্তে সে যা বল্লে তার মর্ম্ম এই যে মুর্শিদাবাদের ওদিক থেকে একটি ভদ্রলোক সপরিবারে এইখানে গাড়ী বদ্‌লাবার জন্যে নেমেছিলেন পশ্চিমের লাইনে যাবার জন্যে, তাঁর স্ত্রী প্ল্যাটফর্ম্মে নেমেই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান, সম্প্রতি দেখা যাচ্চে অজ্ঞান নয়, তিনি মারাই গেছেন।

লোকের ভিড় পুলিস এসে সরিয়ে দিল। তারপর একটা অতি করুণ দৃশ্য চোখে পড়ল। গোটা দুই ষ্টীলের তোরঙ্গ, একটা ঝুড়ি, গোটা চারেক ছোট বড় পুঁটুলি—একটা মানকচু ও এক নাগরী খেজুরের গুড়

এদিক ওদিকে অগোছালো ভাবে ছড়ানো গৃহস্থালীর এই দ্রব্যাদির মধ্যে একটি পাড়াগাঁয়ের বৌয়ের মৃতদেহ, রং ফর্সা, বয়স কুড়ি বাইশের বেশী নয়। বৌটির মাথার কাছে একটী মধ্য বয়সী ভদ্রলোক, গায়ে কালো বুকখোলা কোট--কাঁধে একখানা জম্‌কালো পাড় ও কল্কাদার সস্তা আলোয়ান, পায়ে ডার্ব্বি জুতো—পাড়াগাঁয়ের অর্দ্ধশিক্ষিত ভদ্রলোকের পোষাক। তাঁর কোলে একটী বছর আড়াই বয়সের ছোট ছেলে—মায়ের মত ফর্সা, চুলগুলি কোঁকড়া কোঁকড়া, হাতে কি একটা নিয়ে নাড়াচাড়া করচে ও একত্র করায় বিস্ময়ের দৃষ্টিতে সমাগত লোকের ভিড়ের দিকে চাইচে। মায়ের মৃতদেহের চেয়েও তার কাছে বেশী কৌতুহলের বিষয় হয়েচে চারিধারে এই গোলমাল ও অদৃষ্টপূর্ব্ব লোকের ভিড়।

একটু পরে সাহেব ষ্টেশন মাষ্টার ও তাঁর সঙ্গে একজন ভদ্রলোক এলেন। বুঝতে দেরী হোল না যে ভদ্রলোকটি ডাক্তার, তিনি বৌটির নাড়ী দেখলেন, চোখ দেখলেন, ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে কি কথা হোল তাঁর, স্বামীটির সঙ্গেও কি যেন বল্লেন তারপর তাঁরা চলে গেলেন।

মৃত্যুই তা হোলে ঠিক!···

কৌতুহলী জনতা আরও খানিকক্ষণ তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রৈল—মৃতা পল্লীবধূ, তার শোকস্তব্ধ স্বামী, অবোধ ক্ষুদ্র পুত্র ও তাদের ঘর গৃহস্থালীর সাধের দ্রব্যাদি। তারপর একে একে যে যার কাজে চলে গেল—আরও নতুন দল এল—তারাও খানিকটা থেকে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি কর্ত্তে কর্ত্তে ফিরে গেল। এবার এল রেলওয়ে পুলিশের লোক, তারা খানিকক্ষণ ধরে ভদ্রলোকটিকে কি সব প্রশ্ন কর্ল্লে

নোটবুকে কি টুকে নিলে—তারপর তারাও চলে গেল—কেবল একজন কনষ্টেবল একটু দূরে দাঁড়িয়ে রৈল।

এ সবে কাটল প্রায় এক ঘণ্টা! তখন সন্ধ্যে প্রায় হয়-হয়। ষ্টেশনের আলো জ্বালিয়েচে, আপ্ ডাউন দুদিকের সিগন্যালে লাল সবুজ বাতির সারি জ্বলেচে; কিন্তু তখনও অন্ধকার হয় নি, সিগন্যালের পাখা তখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, আপ্ লাইনের হোম ষ্টার্টার নামালো—বোধ হয় কোনো ট্রেণ আসচে।

যা হবার তা তো হয়ে গিয়েচে এখন সৎকারের ব্যবস্থা? এ ধরণের প্রশ্ন কেউ ভদ্রলোকটীকেও কল্লেন না—তিনিও কাউকে কল্লেন না। এদিকে ভিড় ক্রমেই পাৎলা হয়ে এল—অনেকেই আপ ট্রেণের যাত্রী—কলকাতার দিকে দুখানা সিগন্যাল নামানো দেখে তারা ওভার ব্রিজ দিয়ে উঠি-পড়ি অবস্থায় ছুটলো আপ প্লাটফর্মের দিকে। এটা যে থ্রু ট্রেণ আসচে, তা ভেবে তখন কে দেখে? ভিড়ের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল হিন্দুস্থানী কুলী খালাসীর দল, তারা খৈনি টিপ্‌তে টিপ্‌তে নিজেদের কাজে চলে গেল।

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলুম—ভদ্রলোক আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে যেতেই আকুল ভাবে বল্লেন—মশাই আপনি তো দেখচেন, একটা ব্যবস্থা করুন দয়া করে। এখন কি করি আমার মাথামুণ্ডু, এই অচেনা দেশ, তাতে শীতের রাত। আমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের দেহ শেষে কি অন্য জাতে ছোঁবে?...এই একটা বাচ্চা, এরই বা উপায় কি করি?

মুখে অবিশ্যি তাঁকে সাহস দিলুম। কিন্তু তারপর আধ ঘণ্টা

এদিক ওদিক ঘুরেও সংকারের কোনো ব্যবস্থাই আমায় দিয়ে হয়ে উঠলো না। না আমাকে এখানে কেউ চেনে, না আমি কাউকে চিনি—অধিকাংশ লোকই বলে তারা যাত্রী, এই ট্রেণেই তাদের অমুক জায়গায় যেতে হবে। কেউ কথা শোনে না। আকস্মিক ব্যাপারের উত্তেজনাটুকু কেটে যাবার পরে সবাই বুঝেচে বেশী ঘনিষ্টতা কর্ত্তে গেলে এই শীতের রাত্রে দুর্ভোগ আছে কপালে—কাজেই সবাই আমায় এড়িয়ে চল্‌তে চায়। অবশেষে একজন টিকিট কলেক্টরকে কথাটা বল্লুম। অনেক সাধ্য সাধনার পরে তাকে রাজীও করানো গেল। তিনি বল্লেন কিন্তু শুধু আমি আর আপনি এতে তো হবে না?···আপনি দাঁড়ান··আমি দেখে আসি।

একটু পরে একজন অতি কদর্য্য চেহারার ময়লা কাপড় পরা লোককে সঙ্গে করে তিনি ফিরে এলেন। আমায় বল্লেন—শুন্নুন মশাই লোক যেতে চায় না কেউ শীতের রাতে। এই লোকটী ভাল বামুন, আমাদের ইষ্টিশানে পাঁউরুটির ভেণ্ডার, এ যেতে রাজী হয়েচে, এ আরও দুজন লোক আনতে রাজী আছে। কিন্তু—

টিকিট বাবু সুর নীচু করে বল্লেন—জানেন তো ছোট লোক—ওদের কিছু খাওয়াতে হবে নৈলে রাজি হবে না। একটু ইয়ে—মানে—বুঝলেন তো? ওরা নেশাখোর লোক, লেখাপড়া জানে না—সবই বুঝতে পারচেন। তার একটা ব্যবস্থা কর্ত্তে হয়—

আমি বল্লুম—সে কি রকম খরচ পড়বে না পড়বে আমায় বলুন, আমি গিয়ে বল্‌চি। ঘাট খরচের হিসেবটাও ধরবেন—টিকিট বাবু টাকা পনেরোর এক ফর্দ্দ দাখিল করলেন। আমি ফিরে গিয়ে বল্‌তেই

ভদ্রলোক মণিব্যাগ খুলে দুখানা দশ টাকার নোট আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—এই নিন্—যা ব্যবস্থা করবার করুন, আমায় এ দায় থেকে উদ্ধার করুন, বাঁচান আপনি—কথা শেষ না করেই আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধর্ত্তে এলেন—আর আমার এই খোকার একটা কিছু—ওকে তো এই ঠাণ্ডায় সেখানে নিয়ে যেতে পারিনে তাহোলে ও কি বাঁচবে ?···

আমি ফিরে এসে খোকার কথা তুলতেই তিনি বল্লেন—আমার তো ফ্যামিলি এখানে নেই, তা হোলে আর কি কথা ছিল ? আচ্ছা দাঁড়ান, দেখি ছোট বাবুর বাসায়—

ছোট বাবুর বাসায় খোকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বল্লুম দিন্ ওকে আমার কাছে। ছোট বাবুর বাসায় তাঁরা রাখবেন বলেচেন।

ভদ্রলোক বল্লেন—যাও খোকন বাবা, বাবুর কাছে যাও। তোমার মাসীমার বাড়ী নিয়ে যাবেন, যাও বাবা—

তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো। আমায় বল্লেন—অনেকক্ষণ কিছু খায় নি, রাণাঘাটে ওর মা গজা কিনে দিয়েছিল—একটু গরম দুধ যদি—

খোকা বেশ সপ্রতিভ। বেশ শান্ত ভাবেই আমার কাছে এল, হাসি হাসি মুখে। তাকে কোলে নিয়ে মনে হোল খোকার যত বয়স ভেবে ছিলুম তার চেয়ে ছোট—এখনও তেমন কথা বলতে পারে না। ছোট বাবুর বাসায় ঝি তাকে কোলে করে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। ওকে কোলে তুলে নিয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বল্লে—আহা এ যে

একেবারে দুধের বাছা? এস এস সোনামণি আহা! মাণিক আমার—

খোকা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারেনি, বরং এত লোক তাকে কোলে নিয়ে নাচানাচি করাতে সে খুব খুসি।

একটু পরে আমরা কজনে মৃতদেহ বহন করে শ্মশানের দিকে রওনা হলুম। আমি, পাঁউরুটির ভেণ্ডার, টিকিট বাবু ও পাঁউরুটি ভেণ্ডারের একজন বন্ধু। টিকিট বাবুর এক ভাইপো আমাদের সম্মিলিত গরম কোট ও আলোয়ানের পুঁটুলি হাতে ঝুলিয়ে পিছনে পিছনে আসছিল। সকলের পিছনে ভদ্রলোকটি; তাকে আমরা অবশ্য শব বহন কর্ত্তে দিইনি। ভদ্রলোকের জিনিষপত্র মৃতদেহের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়েচে, কারুর বাসায় জায়গা দেবে না, সেগুলি ষ্টেশনে ক্লোকরুমে জমা দেওয়া হোল। নৈহাটীর বাজার যেখানে প্রায় শেষ হয়েচে, সেখানটায় এসে ভদ্রলোক বল্লেন—একটা ভুল হয়ে গিয়েছে, দাঁড়ান আমি সিঁদুর কিনে আনি ওর কপালে দিয়ে দিতে হবে।

শ্মশানঘাট নৈহাটী ষ্টেশন থেকে প্রায় তিন পোয়া পথ দূরে। বাজার ছাড়িয়ে দক্ষিণে মাঠের মাঝখান দিয়ে পথ, সুমুখে জ্যোৎস্নারাত, সন্ধ্যার পরে মেঘশূন্য আকাশে ফুটফুটে চাঁদের আলো ফুটেচে, কন্‌কনে হাড়কাঁপানি শীত, মাঝে মাঝে পৌষ রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া বাধাশূন্য প্রান্তরে আমাদের শিরার উপশিরার রক্ত জমিয়ে দিচ্চে, তার ওপরে মুস্কিল; আমন ধানের জমির ওপর দিয়ে পথ—ধান কাটা হয়ে গিয়েচে, শীতের ঘায়ে ধানের গোড়া গুলো পায়ে যেন কুশাঙ্কুরের মত বিঁধছিল।

হঠাৎ পিছন থেকে ভদ্রলোক মেয়েমানুষের মত আকুল সুরে

কেঁদে উঠলেন। আমরা অবাক হয়ে ফিরে চাইলুম। টিকিটবাবু বল্লেন—ওকি মশাই ওকি, অত ইয়ে হোলে চল্‌বে কেন—ছিঃ—আসুন, এগিয়ে আসুন।

পুরুষ মানুসকে অমন অসহায় ভাবে কখনো কাঁদ্‌তে শুনিনি, তখন বয়েস ছিলো অল্প, লোকটীর কান্না শুনে যেন আমার চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তারপর তিনি চুপ কর্ল্লেন, আমরা সবাই আবার চুপচাপ চল্‌তে লাগলুম।

শ্মশানে যখন পৌছানো গেল, রাত তখন সাড়ে সাতটা হবে। মৃতদেহ চিতায় উঠানো হোল। সেই সময় সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য কর্ল্লুম বধুটীর দুপায়ে আল্‌তা—কোথাও বেরুতে হোলে গ্রামের মেয়েরা পায়ে আল্‌তা পরে থাকে জান্‌তুম, মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল, মেয়েটি কি ভেবেছিল আজ কোন্ যাত্রার জন্যে তাকে দুপুরে আল্‌তা পরতে হয়েছিল? কপালে খানিকটা সিঁদুর—ভদ্রলোকটী নিজেই দিয়ে দিয়েছিলেন—বধুটীকে সর্ব্বপ্রথম এই ভাল করে দেখে মনে হোল সত্যই সুন্দরী। টানা টানা জোড়া ভুরু, পাণ্ডুর বর্ণের গৌর মুখ, অনিন্দ দেহ-কান্তি মৃত্যুতেও যেন ম্লান হয়নি, মুখের চেহারা দেখে মনে হয় যেন ঘুমিয়ে পড়েচে। মনে হচ্ছে গোলমালে এখুনি ঘুম ভেঙে উঠে পড়বে বুঝি।

জ্বলন্ত চিতার একটু দূরে সেই পাঁউরুটীর ভেণ্ডার ও তার বন্ধু। পাঁউরুটী ভেণ্ডার আমার দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হেঁসে বল্লে—যাক্, আজ শীতের রাতটা কাট্‌বে ভালো—কি বলেন? লালু চক্কোত্তির পরেটার দোকানে ভাজ্‌তে দিয়ে এসেছি। আমাদের শশী আচার্য্যকে

বসিয়ে রেখে এসেচি, রাত বারোটার মধ্যে এখানকার কাজ শেষ হয়ে যাবে—গরম গরম বেশ—

তার বন্ধু বল্লে—মাংস কতটা ? কুলুবে তো ?

—বাঃ জোনাজাং দেড়পোয়া হিসেব করে দিয়ে এসেচি—মোট তিনসের--কজন আছি আমরা, তুমি, আমি, যতীন বাবু, যতীনবাবুর ভাইপো লালু, শশী আচার্য্যি, (আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে) এই বাবু—

আমি বল্লুম—আমি খাবো না।

দুজনেই আশ্চর্য্য হয়ে আমার মুখের দিকে চাইলে। আমার কথা যেন বুঝ্তেই পাল্লে কি না কিংবা বুঝে বিশ্বাস কর্ত্তে পাল্লে না। পাঁউরুটী ভেণ্ডার বল্লে—খাবেন না কিছু? সে কি মশাই! এই হাড় কন্‌কনে পোষ মাসের রাত খাবেন না তো এলেন কেন?...পাগল!... তার বন্ধু বল্লে—খাবেন না কেন? ভাল জিনিস মশাই, আমরা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কিনিয়েচি—খাসা চর্ব্বিওয়ালা খাসি। লালু চক্কোত্তি নিজে রাধ্‌বে, অমন মাংস রাঁধিয়ে গঙ্গার এপারে পাবেন না। ওই যে দেখ্‌চেন নৈহাটীর বাজারের চাটের দোকানখানা—শুধু ওর রান্নার গুণে আজ পনেরো বছর এক ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েচে—দেখবেন খেয়ে—

এই সময় টিকিট বাবুর ইসারায় দুজনেই অন্যদিকে একটু দূরে কি জন্যে উঠে গেল এবং একটু পরেই আবার নিজেদের জায়গাটীতে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে এসে বস্‌ল। আমায় বল্লে—আপনার চলে না বুঝি?

আমি বল্লুম কি?

—একটু আধটু...এই শীতের রাতে, নৈলে চলে কি করে বলুন...

বেশ ভাল মাল...কেন এদের টিকিট বাবু ডেকেচে ও দিকে, তখন ব্যাপারটা বুঝ্‌লুম। ও আমার চলে না শুনে তারা আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এই শীতের রাতে শ্মশানে আস্‌বার স্বার্থটা যে আমার কি, এ তারা ভেবেই পেলে না। আমার দিকে আর কোনো মনোযোগ না দিয়ে তারা নিজেদের বিষয় কথাবার্ত্তা বল্‌তে লাগ্‌লো। নৈহাটী ষ্টেশনে পাঁউরুটীর ব্যবসা করে আর কেউ কিছু কর্ত্তে পারবে না। রেল কোম্পানীর লাইসেন্সের দাম ক্রমেই বাড়চে, তার ওপরে শিখেরা এসে চায়ের ষ্টল্ খুলে ওদের অর্দ্ধেক ব্যবসা মাটী করেচে। খরচা ওঠাই দায়! দেশে সুবিধে নেই তাই ওরা পেটভাতায় এখানে পড়ে আছে। নইলে কাঁথিতে ওদের অমন চমৎকার দোকান ছিল—

পাঁউরুটী ভেণ্ডারটীর নাম বিনোদ বাঁড়ুয্যে। সে আর একবার উঠে গেল ওদিকে। আমি ওর বন্ধুকে জিজ্ঞেস্ কর্লুম—খাবার টাবার কত খরচ হোল?

—তা প্রায় টাকা সাতেক ধরুন। কিছু মিষ্টিও আছে। তা ছাড়া দু'একটা—আপনার তো দেখ্‌চি ওসব চলে না।

বিনোদ ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে আবার গল্প সুরু কর্লে। হঠাৎ আমার মনে পড়ল আমার গরম কোটের পকেটে বিস্কুট আছে, নৈহাটীর প্লাট্‌ফর্ম্মে কিনেছিলুম সেই, কিন্তু খাওয়া হয় নি। টিকিট বাবুর ভাই-পোকে ডেকে বল্লুম—আমার কোটের পকেটে বিস্কুট আছে, দয়া করে আমার মুখে খানকতক ফেলে দিন্ না—আমি এই হাত আর ওতে দেবো না—

আমায় ওভাবে বিস্কুট খেতে দেখে টিকিটবাবু অবাক্ হোলেন।

আমি শব ছুঁয়ে স্নান না করেই বিষ্কুট খাচ্চি! আমায় বল্লেন—আপনার খুব খিদে পেয়েচে দেখ্‌চি—তা চলুন, নৈহাটীতে ফিরে খুব খাওয়াবো—

আমি বল্লুম আমি খাবো না কিছু। তাছাড়া, আমি ষ্টেশনের দিকেও যাবো না—এখান থেকে সোজা ভাটপাড়া চলে যাবো।

—খাবেন না আপনি সে কি মশাই? না না তাকি হয়? অতটা মাংস...ওহে বিনোদ, কাঠ দাও ঠেলে—বসে বসে গল্প গুজব করবার জন্যে তোমাদের আনা হয় নি—

টিকিট বাবু আমার দিকে চেয়ে আবার কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন কিন্তু আমি তাঁকে সে সুযোগ না দিয়েই নিজের জায়গাটীতে গিয়ে বস্‌লুম।

বিনোদ বাঁড়ুয্যে চিতায় কাঠ ঠেলে দিয়ে ফিরে এসেচে। দুই বন্ধুর মুখের বিরাম নেই। এবার তারা কার বিয়ের কথা আলোচনা করচে—বোধ হোল বিনোদ বাঁড়ুয্যের ভাইয়ের। বিনোদ এক পয়সা সাহায্য কর্ত্তে পারবে না। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে বিনোদের বৌ ওর কাছে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল সে দুটো টাকা বাড়ীতে মনি অর্ডার করে দ্যায়।

—সোজা লিখে দিলাম দু'টাকার বেশী হবে না—এতে ভাই দুতীয়েই করো—

বিনোদের বন্ধুটী বল্লে—আর বোনদুতীয়েই করো—হিহি—কি বলো?—

বিনোদ দু'পাটী দাঁত বার ক'রে হেঁসে বল্লে—হ্যা, হ্যা—তাই বলি, বিয়ে কল্লে'ই হয় না। তুলো দেখ্‌তে নরম, ধুন্‌তে লবেজান—বিয়ে করে এই বাজারে সংসারটী চালানো—সে বড় ঠ্যালা।..

রাত অনেক বেশী—বোধ হয় এগারোটা। হালিসহর জুট মিলের আলোর সারি নিবে গিয়েচে। প্রকাণ্ড একটা অশরীরী পাখী যেন জ্যোতির্ম্ময় পাখা মেলে গঙ্গার ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে, এক একবার সেটা যেন জলের কাছাকাছি আসচে, স্নিগ্ধ জ্যোঃতির বিশাল প্রতিবিম্ব ফুটে উঠচে গঙ্গার বুকে—আবার যখন দূরে চলে যাচ্ছে, তখন অল্প সময়ের জন্যে সে জায়গাটা অন্ধকার···আবার আলো ফুটে উঠ্‌ল, আবার অন্ধকার।

এতক্ষণ ভদ্রলোকটী চিতার শিয়রের দিকে একটু দূরে চুপ করে বসে ছিলেন। হঠাৎ তিনি আমার পাশে উঠে এলেন! বল্লেন—খোকা বোধ হয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েচে—কি বলেন?

—হ্যাঁ, এতক্ষণ নিশ্চয়ই।

খানিকটা চুপ করে থেকে বল্লেন—কাল সকালে নৈহাটীতে দুধ পাওয়া যাবে না মশাই?

—অভাব কি? সে জন্যে ভাববেন না। সে যোগাড় হয়ে যাবে।

একটু চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞেস্ কর্ল্লুম—আপনারা কোথায় যেতেন? পশ্চিমে কোথাও বুঝি?

ভদ্রলোক বল্লেন—পশ্চিমে বেশী দূর নয়—আমি যাচ্ছিলাম আসান-সোলে। সেখানে চাকুরী করি। অনেক দিন চাকুরী খুঁজে বেড়িয়ে বেড়িয়ে শেষে ওইটী জুটিয়েছিলাম। তা চাকুরীও করচি আজ এক বছর, এতদিন রেল বাবুদের মেসে খেতাম। আশ্বিন মাসে মেসে খেয়ে খেয়ে ডিস্‌পেপসিয়া গোছের দাঁড়ালো। এত ঝাল দ্যায়, মশাই অত ঝাল খাওয়া আমার অভ্যেস্ নেই। আমার স্ত্রী বল্লে—যা পাও, একটা

বাসা করো, আমাদের দুজনের খুব চলে যাবে। তোমারও কষ্ট থাক্‌বে না, আমারও এখানে তোমায় বিদেশে ফেলে থাক্‌তে ভাল লাগে না। তাই এবার বাসা ঠিক করে বড়দিনের ছুটীতে একে আন্‌তে যাই শ্বশুর বাড়ীতে—সেখানেই বিয়ের পর আজ চার পাঁচ বছর রেখেছিলাম। দেশে আমার বাড়ী ঘর সবই আছে, কিন্তু সেখানে মশাই সরিকী গোলমাল। সেখানে ওকে রাখার অনেক অসুবিধে—বার দুই নিয়ে গিয়েছিলাম, তাতেই জানি।

আমি বল্লুম—ওঁর কি কোনো অসুখ ছিল—হঠাৎ এমন—

—অসুখের কথা তো কিছুই জানি নে। তবে মাঝে মাঝে বুক ধড়ফড় করতো বল্‌তে শুনেচি।

অসুখটা আমার বাড়ীতে যখন আনি আর বছর, তখন বড় বেড়ে-ছিল। আমার সে সময় নেই চাকরী, হাতে পয়সা আর এদিকে বাড়ীতে আমার জ্যাঠ্‌তুতো ভাইয়ের স্ত্রী—তাঁর যৎপরোনাস্তি দুর্ব্যবহার। এই সবে সংসারে শান্তি তো ছিল না একদণ্ড?...ও আবার ছিল একটু ভাল মানুষ মতো—ওর ওপরই যত ঝক্কি।

খানিকটা আপন মনেই যেন বল্‌তে লাগলেন - কালও বিকেলে কত কথা বল্‌লেচে। বাসার কথা আমায় কত জিগ্যেস্ কর্ল্লে। বল্‌ছিল, সেখানে পাতকুয়ো না পুকুর? আমি বল্লাম—দুইই আছে। তবে পুকুরে রেলের কুলী চাপরাশীরা নায় আর কাপড় কাচে—তার চেয়ে তুমি বাসার পাতকুয়ার জলেই নেও। খাবার জন্যে রেলের বাবুদের কোয়ার্টারে টিউবওয়েল আছে—নিকটেই—সেখান থেকে জল আনাবো। বাসায় পেঁপে গাছ আছে শুনে কত খুসি! বল্লে, হ্যাঁগা ওদেশের পেঁপে

নাকি খুব বড় বড়? কালদুপুরের পর থেকে বাক্স গুছিয়েচে...মানকচু সঙ্গে নিয়ে যাবে বলে বিকেলে বেছে বেছে বড় মানকচুটা ওর ভাইকে দিয়ে তোলালে। রাত্রে ঘুমোয় না—কেবল বাসার গল্প করে...এ করবো...ও করবো...আমায় বল্লে—পেতলের ডেক্‌চিতে খেয়ে খেয়ে তোমার অসুখ হয়েচে—তারা তো আর তেমন মাজে না?...অসুখের আর দোষ কি? সেখানে মাটীর হাঁড়ি-কুড়ি পাওয়া যাবে তো?... রাত অনেক হয়েছে দেখে আমি বল্লাম—শোও ঘুমোও, কাল আবার সারাদিন গাড়ীর কষ্ট হবে...রাত দুপুর হোল...ঘুমিয়ে পড়...কোথায় চলে গেল আজ...আর আমায় রেঁধে খাওয়াতে আস্‌বে না।...

হঠাৎ একটা গোলমাল ও বচসার আওয়াজে ভদ্রলোক ও আমি দুজনেই ফিরে চাইলুম। বিনোদ বাঁড়ুয্যে ও তার বন্ধু টিকিটবাবুর সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছে এবং আমার মনে হোল তারা এমন সব কথা বল্‌চে যা হয়তো তারা স্বাভাবিক অবস্থায় বল্‌তে সাহস কর্তো না টিকিট বাবুকে। বিনোদ বাঁড়ুয্যে বল্‌চে, যান্ যান্ মশাই অনেক দেখেচি ওরকম—আমরা গড়বাড়ীর বাঁড়ুয্যে—সুতোহাটা পরগণার মধ্যে যেখানে যাবেন ওদিকে তমলুক এস্তেক—আমাদের এক ডাকে চেনে—ছোটনজর যেখানে দেখি সেখানে আমরা থাকিনে। এই শীতের রাতে কে আস্‌তো মশাই? আমাদের আগে খোলসা করে আপনার বলা উচিত ছিল, তা হোলে দেখ্‌তাম নৈহাটীর বাজার থেকে কোন্ ব্যাটা পৈতেওলা বামুন আজ মড়া নিয়ে আস্‌তো...মুর্দ্দফরাস দিয়ে না যদি...

ব্যাপার কি উঠে দেখতে গেলুম! বিনোদ বাঁড়ুয্যে আমায় দেখে বল্লে, এই তো এই ভদ্দর লোক রয়েচেন—আচ্ছা বলুন তো আপনি?...

আমরা সকলের আগে বলে দিয়েচি আমাদের এই চাই এই চাই...এখন আসলে হাত গুটোলে চল্‌বে কেন?...আপনিই বলুন তো?...হ্যাঁ মানুষ বলি এই বাবুকে...কোনো লোভ নেই, উনি খাবেন না, কিছু করবেন না—উনি এসেচেন মড়া নিয়ে এই শীতে। উনি বল্‌তে পারেন—ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিতে হয়—

ঝোঁকের মাথায় বিনোদ বাঁড়ুয্যে সত্যিই আমার পায়ে হাত দেবার জন্যে ছুটে এল। আমি সেখান থেকে সরে পড়লুম—এদের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার ভাগ বাঁটোয়ারা সংক্রান্ত কথার মধ্যে আমার থাক্‌বার দরকার কিসের?

মনে কেমন একটা দুঃখ হোল। এই অভাগিনী পল্লী বধুর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার উপযুক্ত সম্মান এখানে রক্ষিত হোল না। মনে হোল ও এখানে কেন? এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গঙ্গার উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গ, এই হিমবর্ষী, নক্ষত্র-বিরল বিরাট আকাশ,এই অমঙ্গলময়ী মহানিশার মৃত্যু অভিযান—জীবনের নানা ছোট খাটো সাধ যাদের মেটেনি, এ রুদ্র আহ্বান তাদের বেলা আর কিছুদিন স্থগিত রাখলে বিশ্বকর্ম্মার কাজের কি ক্ষতিটা হোত?...ছোট্ট একটি গৃহস্থ বাড়ীর দাওয়ায় মেয়েটি খোকাকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে, সবে সে নদীর ঘাট থেকে গা ধুয়ে এসেচে, পায়ে আল্‌তা, কপালে টিপ্, খোঁপাটী বাঁধা—ওকে মানায় জীবনের সেই শান্ত, পটভূমিতে—শ্মশানে মাতালের হুড়াহুড়ির মধ্যে ওকে এনে ফেলা যেমনি নিষ্ঠুর তেমনি অশ্লীল...

রাত দুপুর।...

বিনোদ বাঁড়ুয্যে হঠাৎ কি মনে করে আমার সাথে এসে বস্‌লো।

সে আমার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান হয়ে উঠেচে...আমি কি করি, কোথায় থাকি, বাড়ীতে কে কে আছে,—এই সব নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্লে।

—আপনি মশাই এর মধ্যে মানুষ। মানুষ চিনি মশাই, আজ না হয় দেখ্‌চেন ইষ্টিসানে পাঁউরুটি ফিরি করি...আমরা গড়বাড়ীর বাঁড়ুয্যে...যান্ যদি কখনো ওদিকে, পায়ের ধূলো ঝেড়ে দিলেই বুঝতে পারবেন—সুতোহাটা পরগণার মধ্যে—

সব শেষ হতে রাত একটা বাজ্‌লো। চাঁদ ঢলে পড়েচে।

চিতা ধূতে গিয়ে ভদ্রলোক আবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠ্‌লেন—আমরা অনেক সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে থামালুম। আমি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা পিসিমার বাড়ী চলে আস্‌বো—ওরা কিছুতেই ছাড়ে না। টিকিটবাবু বল্লেন—আসুন আসুন অতটা মাংস খাবে কে? সব গরম গরম পাবেন—আমার বলে দেওয়া আছে—রাত বারোটার পরে তবে ময়দায় জল দেবে। গিয়েই গরম গরম...চলুন মশাই ··

অতি কষ্টে ওদের হাত এড়িয়ে পিসিমার বাড়ী ফিরলুম। কিন্তু সকালে উঠেই খোকাকে দেখ্‌বার ইচ্ছে হোল। সাড়ে সাতটার ট্রেণে নৈহাটি গিয়ে ছোটবাবুর বাসায় হাজির। খোকা নাকি অনেকক্ষণ উঠেচে। ভোরবেলা থেকে মায়ের কাছে যাবার জন্যে কাঁদ্‌ছিল, বাসার মেয়েরা অনেক কৌশলে থামিয়ে রেখেচেন।

ভদ্রলোকটিও এলেন। তিনি টিকিটবাবুর বাসায় রাত্রে শুয়েছিলেন—দেখে মনে হোল রাতে বেশ ঘুমিয়েচেন। খোকা এখন আর কাঁদচে না। বাসার মেয়েরা কমলালেবু দিয়েচে হাতে; তাই খেতে খেতে

ঝিয়ের কোলে বাইরে এল! ঝি বল্লে কাল ছোটবাবুর বৌ নিজের কোলের কাছে ওকে নিয়ে শুয়েছিলেন। জেগে উঠ্‌লেই মুখে মাই দিয়েচেন, রাতে ঘুমের ঘোরে ও ভেবেচে ওর মা। কিন্তু ভোরে উঠেই সে কি কান্নাটা! কেবল বলে 'মা যাবো' 'মা যাবো'—আহা বাছা আমার, মাণিক আমার···

একটু পরে আমি ভদ্রলোককে ট্রেণে তুলে দিতে গেলুম, খোকাকে কোলে নিয়ে। তিনি এই ট্রেণে মুর্শিদাবাদে শ্বশুর বাড়ী ফিরে যাবেন। আমায় বল্লেন—কি ক'রে সেখানে ঢুক্‌বো মশাই, ভেবে আমার হাত পা আস্‌চে না। তবে যেতেই হবে, খোকাকে ওর দিদিমার কাছে দিয়ে আস্‌বো—নইলে কে দেখ্‌বে আর ওকে?

তারপর পাগলের মত হাসি হেসে বল্লেন—যাত্রাটা বদ্‌লে আসি মশাই? কি বলেন?...হা—হা—

আমি বল্লুম—টিকিটবাবু কাল আপনাকে কিছু ফেরত দিয়েচেন?

না, আমিও চাই নি। তবে আজ সকালে একটা ফর্দ্দ দেখাচ্ছিলেন, বল্লেন সব খরচ হয়ে গেছে। সে ফর্দ্দ আমি দেখিও নি—যা উপকার করেচেন আপনারা, তার শোধ কি কখনো দিতে পারবো?··

ট্রেণ ছেড়ে চলে গেলো।...

প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে বিনোদ বাঁড়ুয্যের সঙ্গে দেখা। আমায় একপাশে ডেকে মুখ ভার করে বল্লে—শুনেচেন টিকিটবাবুর আক্কেলটা? সাড়ে সাৎটাকা হাতে ছিল কালকের দরুণ। কাল রাতে খাওয়া দাওয়ার পরে বল্লাম—ভাগ করো। তা আমাদের দিলে একটাকা করে—দুজনকে দু'টাকা। নিজে নিলে সাড়ে পাঁচটাকা। বলে ওদের দুজনের ভাগ ও আর ওর

ভাইপো। আচ্ছা ভাইপো কি করেচে মশাই? শুধু কাপড়ে পুঁট্‌লিটা হাত ঝুলিয়ে গিয়েচে বৈ তো নয়?...আর আমাদের কঁ. যে...চামার ..চামার...আমাদের অত ছোট নজর নেই...হাজার হোক কুলীন বামুনের ছেলে মশাই...না হয় পেটের দায়ে আজ পাউরুটি ফিরিই করি...

—শেষ—